চতুর্থ অধ্যায়ঃ

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের আঙ্গিক ঃ

- ‘ জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ’
- ‘ চলনবিল ’
- ‘ অশ্বত্থের অভিশাপ ’
- ‘ কেরী সাহেবের মুন্সী ’
- ‘ লালকেল্লা ’
- ‘ বঙ্গভঙ্গ ’
- ‘ পনেরোই আগষ্ট ’

চতুর্থ অধ্যায়

প্রমথনাথের উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

আঙ্গিক শিল্পকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য বিষয়বস্তু, প্রয়োগ নৈপুণ্য উপন্যাসকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলে রচনাকে সুখ্যপাঠ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগুণ সম্পন্ন করে দেয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিক বা ফর্মের সম্পর্ক যেন অনেকটা ফুলের সঙ্গে ফুলদানির সম্পর্ক। বিষয়বস্তু যদি ফুলদানি হয় তবে ফুল হল আঙ্গিক। ফুলদানির সঙ্গে ফুলকে মানানসই করে সাজিয়ে তোলে অভিজ্ঞ মালী ঠিক তেমনি ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিককে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করে তুলতে হয়।

সাহিত্য রূপ ও রস আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু সাহিত্যের তুলাদন্ডের যেন দুটি পাল্লা যার দুপাশের ওজন সমান। দুটোর ভারসাম্য রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠশিল্পীর শিল্পোৎকর্ষের সার্থকতা। যেখানে ভারসাম্য নেই সেখানে রসসিদ্ধির অভাব। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পকৌশল অপরিহার্য অঙ্গ। পরিকল্পনাহীন উপন্যাস শিল্পরূপের পরিপন্থী। বিষয়কে উপেক্ষা করে আঙ্গিক সর্বস্ব প্রসাধন কলাযুক্ত উপন্যাস আর যাই হোক না কেন একটি জীবন্ত আর্টরূপে বিবেচিত হতে পারে না। ঠিক তেমনি আঙ্গিককে গুরুত্ব না দিয়ে বিষয়সর্বস্ব উপন্যাস শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন হতে পারে না। দেহের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে যেমন নিবিড় যোগসূত্র ঠিক তেমনি কথা সাহিত্যের একটি অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রতিভাবান স্রষ্টা সুনিপুণভাবে শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন বলেই তাদের রচনা শিল্পসম্মতহয়ে ওঠে।

উপন্যাসের আঙ্গিক প্রসঙ্গে হীরেন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

" উপন্যাসের আঙ্গিক সংক্রান্ত বিচার বিশ্লেষণের জন্য তিনটি দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। আখ্যানভাগ, চরিত্রচিত্রায়ণ এবং পরিবেশনরীতি এই তিনের সুষ্ঠু সমন্বয়েই উপন্যাস

শিল্প সুষমা লাভ করে।"

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থের রচয়িতা অপর্ণা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন —

" উপন্যাসের আঙ্গিকে দুটি বিষয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি কাহিনী নির্বাচন, দ্বিতীয়টি চরিত্র সৃষ্টি। এই উপন্যাসের কঙ্কাল — সুন্দর ও সুখপাঠ্য ভাষা এ কঙ্কালকে রমণীয় করে তোলে।"

অধ্যাপক ডঃ গুণময় মান্না তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী সমালোচনায় বলেছেন —

" শিল্প সামগ্রিক রূপকর্ম, শিল্পাঙ্গিক রূপকর্মের বিভিন্ন দিক; যেমন দেহরচনা এবং অন্যভাবে হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি রচনা — দুই একই প্রয়াসে সিদ্ধ। উপন্যাস শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক।"

উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস ধারায় একটি উত্তরোত্তর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ তার প্রথম পর্বের উপন্যাস ধারার আঙ্গিকের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস ধারার আঙ্গিকের পার্থক্য রয়েছে। ' জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' মহাকাব্যিক আঙ্গিকে রচিত এবং এক্ষেত্রে রচনারীতি অনেকটাই তদনুসারী অর্থাৎ বিবৃতিমূলক, কিন্তু 'কেরী সাহেবের মুন্সী' থেকে শুরু করে 'পনেরোই আগষ্ট' পর্যন্ত তিনি বহুলাংশে বঙ্কিমী রচনারীতি অনুসরণ করেছেন। নিম্নে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বিভিন্ন আঙ্গিক প্রদত্ত হল ঃ

'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত'

উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ী প্রমথনাথ বিশীর প্রতিভার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থ পরিচিতি অংশে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

" মহাকাব্যের আয়তনে, বিশাল ও বিপুল স্থান - কাল - ব্যাপ্তিতে প্রতিবেশ নির্ভর মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জনায়, বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে, বাঙলার

নদনদীর যুগ ব্যবধানে গতিপথ পরিবর্তনের ঐতিহ্যানুসরণে, প্রকৃতির রূপরেখা ও সূক্ষ্মতর আত্মিক প্রভাবের যে মানচিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে তা কথাসাহিত্যে দুর্লভ। এর মধ্যে লেখকের কবিত্ব শক্তি, জীবনতত্ত্ব ব্যাখ্যান, প্রকৃতি বর্ণনার বর্ণালিম্পন ও তাৎপর্যবোধ, নদী ও বিলের অস্থির আবর্তনের মধ্যে ও মাটি জলের চিরদ্বন্দ্বের প্রভাবে মানব জীবন নীতির ছন্দোভ্রষ্টতার উপলব্ধি— এই সমস্ত গুণই প্রচুর অজস্রতার সহিত উদাহৃত।"[১]

'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসের আঙ্গিকগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

এক ।। আদি মধ্য ও অন্ত সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ নিটোল কাহিনী বৃত্ত। উপন্যাসের সূচনা, চরম মুহূর্তএবং সুনিয়ন্ত্রিত উপসংহার।

দুই ।। ঘটনাবহুল কাহিনীর সঙ্গে মানব মনের যোগসূত্রে সার্থকতা লাভ করেছে।

তিন ।। উপন্যাসের উপকাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আয়তনের দিক থেকে 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' ও 'অশ্বত্থের অভিশাপ' অনেকটা সমধর্মী তুলনায় 'চলনবিল' আকারে ছোট।

চার ।। লেখকের মন্তব্য ও পাত্রপাত্রীদের সংলাপ নাট্যধর্মী।

পঞ্চমত ।। স্বপ্ন, চিঠি, গান, প্রকৃতি উপন্যাসের আঙ্গিকে বৈচিত্র্যতা দান করেছে।

ষষ্ঠত ।। কাহিনী কথনে কোন জটিলতা নেই। সোজাসুজি বিবৃতি বর্ণনায় সময়গত ঐক্য ও স্থানগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে।

সপ্তমত।। মহাকাব্যিক উপন্যাসের উপযোগী তৎসমশব্দ বহুল ওজস্বীপূর্ণ ভাষার সার্থক প্রযোগ ঘটেছে।

অষ্টমত।। মহাকাব্যিক বিশালতা দানের উপযোগী ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের ঐকতান সঙ্গীত বেজে উঠেছে।

প্রথম খন্ড

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'

উপন্যাসের প্লট গঠনের বৈশিষ্ট্য বা উপস্থাপনায় প্যাটার্নের অর্থাৎ পরিবেশন রীতির বিশ্লেষণ, ভাষা ও চরিত্রচিত্রণ আঙ্গিক নির্ণয়ের প্রধান লক্ষ্য। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের আখ্যানগঠন বা গঠন পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

প্রমথনাথ উপন্যাসের শুরু করেছেন মুখবন্ধ দিয়ে যেখানে লেখকের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শুরুতে এ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত বংশ প্রতিষ্ঠাকে তিনি অনুপম বর্ণনা ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন উপন্যাসের নায়ক বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও হাহাকার বর্ণনার মাধ্যমে। জোড়াদীঘি গ্রামের চৌধুরী পরিবারের উত্থানে কাহিনীর সূত্রপাত এবং জমিদারী অবক্ষয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন লেখক।

মহাকাব্যোপম উপন্যাসটির কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে আটটি অধ্যায়ে। বঙ্কিমী রীতি অনুসরণে তিনি প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ করেছেন যেমন, প্রথম অধ্যায়ে 'পূর্বকথা' যেখানে ছয়টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত এখানে তিনি চৌধুরী পরিবারের অতীত ইতিহাস বর্ণনায় মুখর। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন 'চৌধুরী বাড়ি' মোট পনেরোটি অনুচ্ছেদে চৌধুরী পরিবারের আড়ম্বর, শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কার বিশ্বাস, আভিজাত্য বর্ণিত। রক্তদহের রক্তকমল ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দর্পনারায়ণের বিবাহের প্রস্তুতি ও প্রপৌত্র দর্পনারায়ণের স্বরূপের অস্থি বিসর্জনের জন্য পলাশীতে যাত্রার ঘটনা এই অধ্যায়ের মূল বিষয়। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম পলাশী মোট ষোলটি অনুচ্ছেদে গ্রথিত এখানে দর্পনারায়ণের বনমালাকে উদ্ধার ও

বিবাহের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। 'ইন্দ্রাণী' নাম নিয়ে এগারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত চতুর্থ অধ্যায়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরন্তপের বিবাহের ঘটনা স্থান লাভ করেছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন 'বনমালা' ও 'বেণীরায়ের কাহিনী'। আটটি করে অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত এই অংশে বজরা যোগে পদ্মাবক্ষে বনমালা ও দর্পনারায়ণের ভ্রমণ বর্ণনা ও জোড়াদীঘিতে উদয়নারায়ণের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন ঘটনা সন্নিবেশিত। বেণী রায়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ে 'জোড়াদীঘি বনাম রক্তদহ' ২৮টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। এই অধ্যায়টিই সর্ববৃহৎ এখানে ইন্দ্রাণীর প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা, পরন্তপের সক্রিয়তা, জোড়াদীঘি ও রক্তদহের বিরোধের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। দর্পনারায়ণ এর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও কারাবরণ এই অধ্যায়ের ঘটনা। সর্বশেষ অধ্যায়ে উদয়নারায়ণের আর্তকণ্ঠ ও নৈরাশ্য বেদনা উচ্চারিত হয়েছে।

মূল কাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে উপকাহিনী বা শাখা কাহিনীর বিস্তার না ঘটিয়ে একটি মাত্র উপকাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন। পরন্তপ ও চাঁপার উপকাহিনীটি মূল কাহিনীর সঙ্গে এসে শেষ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। উপন্যাসে দর্পনারায়ণ ও বনমালার এবং পরন্তপ ইন্দ্রাণীর দাম্পত্য জীবন চিত্রিত হয়েছে যা উপন্যাসকে মনোরম ও দৃঢ়পিনদ্ধ করে তুলেছে।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের কাহিনীর পরিচ্ছেদ দৈর্ঘ্যের সমতা রক্ষিত হয় নি। পরিচ্ছেদের সমতা কাহিনী দেহের প্রধান অঙ্গ। মোটামুটিভাবে পরিচ্ছেদগুলো কাছাকাছি মাপের হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপ্তম অধ্যায়টি ২৮ টি অনুচ্ছেদে এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়টি সবচেয়ে ছোট চারটি করে অনুচ্ছেদ এটা ঔপন্যাসিকের গঠনগত একটি ত্রুটি বলা যেতে পারে।

উপন্যাসের গঠনরীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এর সময় বিন্যাস। মহাকাব্যিক পটভূমিকায় উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার চৌধুরী পরিবারের শতাধিক বৎসরের উত্থান

পতনের ইতিহাস নিয়ে ট্রিলজি গড়ে উঠেছে। পলাশীর যুদ্ধের ষাট বছর পরের অর্থাৎ ১৮২০ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলোচ্য উপন্যাস ত্রয়ীর সময়কাল। উপন্যাসে সময় গত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। — কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে নি। এতে ঔপন্যাসিকের শিল্পকুশলতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে কাহিনী গঠনে রোমান্টিক রীতির সংযোজন ঘটিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে অতিলৌকিকতাকে শিল্পকুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের তিনটি স্বপ্নদৃশ্য লেখক কাহিনীতে যুক্ত করেছেন। প্রথমটি দর্পনারায়নের স্বপ্ন, দ্বিতীয়টি ইন্দ্রাণীর স্বপ্নদর্শন তৃতীয়টি রমেশ ঢুলির স্বপ্ন দর্শন। প্রথমটিতে উপন্যাস কাহিনীর বাঁক পরিবর্তনের বিন্দুতে এনে দিয়েছে ইন্দ্রাণীর পরিবর্তে বনমালাকে বিবাহের পথনির্দেশ দিয়েছে প্রথম স্বপ্নদর্শন, দ্বিতীয়টি পরন্তপের প্রতি ইন্দ্রাণীর দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে তৃতীয় স্বপ্নে রক্তদহের জমিদার বাড়ীতে বারুদের সাহায্যে অগ্নি সংযোগের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। অতিলৌকিক ঘটনাগুলো উপন্যাসের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে সন্দেহ নেই।

আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে জ্যোতিষগণনা, দুর্গোৎসব, বিশ্বকর্মাপূজা, চূর্ণকবিতা, লোককাহিনী — বেণী রায়ের কাহিনী, ছড়াগান ও চিঠিপত্রের সুষম ব্যবহার করেছেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ। ইন্দ্রাণী প্রদত্ত বনমালাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিটি কাহিনীর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে যা উপন্যাসের কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু পত্রপ্রেরণের ক্ষেত্রে নোটন পায়রার পায়ে বেঁধে দেবার ঘটনা রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত।

ঔপন্যাসিক কাহিনী গ্রন্থণে মহাকাব্যিক উপন্যাসের উপযোগী যুগরুচি ও যুগচেতনা অনুসারে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। স্যাটায়ার, হিউমার, উইট, কমিক, আয়রনি, ট্রাজিক

উপন্যাসের আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন যা মানবরস সংবেদন সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ মহাকাব্যোপম উপন্যাসের উপযোগী ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও জীবনধর্মকে বিশাল কালের প্রেক্ষাপটে জাতীয় জীবনের উত্থান পতন সমৃদ্ধ বিশালায়তন ঘটনার উপস্থাপন করেছেন।

দুই বিরোধী পক্ষের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম মুখর ঘটনা মহাকাব্যিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। জোড়াদীঘি ও রক্তদহ গ্রামের সংঘর্ষ দেখিয়ে মহাকাব্যিক মর্যাদা দান করেছেন। এছাড়া পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা মহাকাব্যিক লক্ষণযুক্ত।

মহাকাব্য রচয়িতা তাঁর সমকালীন বা অতীত কালের বিরাট সংখ্যক মানুষের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলেন। উপন্যাসের নায়ক উদয়নারায়ণ তার সমকালীন সমাজজীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্যরূপের সন্ধান করেছেন। এক বিশাল ক্যানভাসে শত শত মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা, জনসমষ্টির জীবনবোধ ও আবাহন সঙ্গীত ফুটিয়ে তুলে অসাধ্যকে সাধন করেছেন শিল্পী প্রমথনাথ।

ঔপন্যাসিক 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে কাহিনী পরিকল্পনায় নাটকীয়তার সংযোজন করেছেন। কথাসাহিত্যে নাট্যলক্ষণ নাটকীয় গতির নির্ণায়ক। বিশেষ করে মহাকাব্যিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যসংঘাতের সমগ্রতা একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা, পরন্তপের তাঁবুতে দর্পনারায়ণের আবির্ভাব, দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুপণ অসিচালনায় নাট্যদ্বন্দ্ব, গুপ্তকারাগারে পরন্তপকে মুক্তিদেবার জন্য বনমালার আবির্ভাব নাটকীয় আকস্মিকতা সৃষ্টি করেছে। গল্পকথনে নাটকীয়তার বিশেষ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পারিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের

সাফল্য তার শৃঙ্খলাবোধের উপর যেমন নির্ভরশীল তেমনি গঠনের পারম্পর্যরক্ষা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঐক্য গড়ে তুলেছে সন্দেহ নেই। লেখকের কলমে কেন্দ্রীয় চরিত্র ও পার্শ্বচরিত্রগুলি প্রত্যেকটি আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে বলেই চরিত্রগুলি রক্তমাংসের হতে পেরেছে।

উপন্যাসের আঙ্গিকে একাধিক স্থানে স্মৃতিচারণ, আত্মোক্তি, আত্মভাবনাকে ডাইমেনশানে এনেছেন।

আঙ্গিক প্রকরণের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় উপস্থাপনরীতি বা গল্প পরিবেশনের রীতি। উপন্যাসে গল্প পরিবেশনের পদ্ধতি একমুখী নয়, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঔপন্যাসিক গল্প পরিবেশন করেন। কোন পরিবেশে কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে তার উপর ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। গল্পবলার কৌশলেও প্রমথনাথের বৈচিত্র্যচঞ্চল মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে আত্মকথনমূলক রীতি ও ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতি এই দুইভাবেই উপন্যাসের গল্পপরিবেশন করেছেন।

আত্মকথনমূলক রীতি—

(ক) আলিবর্দি বলিল — আমি আসবার জন্য তৈরী হয়েই ছিলাম — কেবল আমার দুষমণটার জন্যই এতদিন আসতে পারি নি।" [২]

(খ) " উদয়নারায়ণ তার চাহনির অর্থ যেন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন — আমি জানি তার শক্তি অনেক বেশী ছিল।" [৩]

(গ) " আমাদের মোতির মা কি বলত জান ? "[৪]

(ঘ) " প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি বসিয়া পড়িল, বলিল শুনবে তো বসো। আমার নাম বেঙা চৌকিদার, আমার বড় ভাইয়ের নাম ফেঙা, তার বড়র নাম পেঙা। আমার ছোট

ভাইয়ের নাম ঠিক করা হয়েছিল ভেঙা, কিন্তু মুসকিল হল এই যে তার জন্মই হল না।" [৫]

(ঙ) " পরন্তপ প্রথমে কথা বলিল ; জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে ?

বনমালা বলিল — আমি চৌধুরী বাড়ীর পুত্রবধূ। ..... পরন্তপ বলিল — ভুলব ! ভুলতে চাই ! কিন্তু আমি ভুললেও যে ভগবান ভোলেন না ! "[৬৭]

(চ) " এই সর্বনাশের খেলায় তোমাকে আমিই নামিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি ইন্দ্রাণী।"

(ছ) " আমি পাষাণী, আমার হৃদয় নাই, হৃদয়াবেগ নাই ; ভালবাসা নাই, ভালবাসার আবশ্যক নাই ; আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে না, আমিও কাউকে ভালবাসি না ; আমার সংসার নাই, সাংসারিকতা নাই ; যে বিধাতা মানুষ গড়েন, আমি তার সৃষ্টি নই ; যিনি গড়েছেন পাহাড় পর্বত, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, কান্তার, আমি তারই রচনা ....." [৭]

উত্তমপুরুষের ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতিতে স্মৃতিচারণের সূত্র ধরে কাহিনী পরিবেশন করে থাকেন। মূল কাহিনীকে থামিয়ে রেখে তিনি ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। মোহনলাল ও মীরমদনের সক্রিয়তা মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহাসিক কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। দর্পনারায়ণের পলাশীর মাঠের অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন দেখতে গিয়ে লেখকের যুদ্ধবর্ণনা অতীতচারিতার দৃষ্টান্ত।

উপন্যাসের বর্ণনাত্মক গদ্যরীতি একটি অনুপম দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

" সেবারও যথানিয়মে দূরদূরান্তের প্রতিমা জোড়াদীঘির ঘাটে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল; জোড়াদীঘির অত্যুচ্চ প্রতিমা বাইশ জন জোয়ান ছেলের স্কন্ধে বাহিত হইয়া জোড়া দেওয়া নৌকার উপর আসিয়া উঠিল ; দেখিতে দেখিতে প্রশস্ত নদী নানা বর্ণের নানা আকারের প্রতিমায় ভরিয়া গেল — নদীর জল বিচিত্র ছায়াপাতে খচিত হইয়া উঠিল।

এই উপলক্ষে জোড়াদীঘির নদীর দুই তীরে প্রকান্ড মেলা বসিত ; ছেলে বুড়ো, যুবক যুবতী, হিন্দু মুসলমান, প্রায় পনেরো বিশ হাজার লোক জমিয়া যাইত। সেবারও তেমনই মেলা বসিয়াছে ; নদীর পারে রাশি রাশি আখ, পাতার বাঁশী, মাটির রং করা পুতুল আর মিঠাইয়ের দোকান। সকলেরই পরনে নূতন কোরা কাপড়, অনেকের গায়ে চাদর, কিন্তু অধিকাংশই খালি গায়ে ; বিবাহিত মেয়েদের সিঁথিতে চওড়া করিয়া সিঁদুরের দাগ — মুখে হাসি ও কৌতূহল।

নদীতে প্রতিমার নৌকা ছাড়াও অসংখ্য নৌকা ; অনেকগুলি বড় বড়, তাতে রং করা হাঁড়ি , পাতিল, কলসী ; আখের নৌকাও আছে; বড় বড় পানসিকে ছাইয়ের উপরে গ্রামান্তর হইতে আগত দর্শকের দল ; যাহাদের একটু অবস্থা ভাল, সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া গান বাজনা করিতেছে ; হো হো করিয়া হাসিতেছে, মাঝে মাঝে সিদ্ধি ও সুরা পান করিতেছে। বহু ছিপ নৌকা বাচ খেলিবার জন্য আসিয়াছে ; আঠার, কুড়ি, ত্রিশজন করিয়া যুবক একসঙ্গে একতালে বৈঠা মারিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাইয়া দিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে ; মাঝে মাঝে বড় নৌকার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নৌকা ডুবিতেছে — সকলে সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতেছে, তাহাতেও আনন্দ কম নয়।"[৮]

— আলোচ্য অংশটিতে জোড়াদীঘিতে বিজয়া দশমী তিথিতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের দিনের এক আনন্দঘন পরিবেশ রচনায় লেখকের নৈপুণ্য দেখা গেছে। বর্ণনায় রূপ ও রীতির দিক থেকে সহজ ও স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করেছে। ছোটখাটো ডিটেল্‌সের কাজে প্রমথনাথ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ; নানা বর্ণের নানা আকারের প্রতিমা, রাশি রাশি আখ, পাতার বাঁশী, মাটির রং করা পুতুল, রং করা হাঁড়ি, পাতিল, কলসী, ছিপনৌকা, জোড়া দেওয়া নৌকা প্রভৃতির অনবদ্য বর্ণনায় লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে।

অংশটির শব্দ সমাবেশ পদ প্রকৃতি, বাক্যগঠন প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করলে কয়েকটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। লেখকের শব্দ ব্যবহারে বাহুল্যতা নেই, অল্পকথায় নিরলঙ্কৃত ভাষায় তিনি দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ উৎসব মুখরিত অধ্যায়ের সার্থক বর্ণনা দিয়ে পরিস্থিতিটাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছেন।

উক্ত অংশে প্রচলিত অলঙ্কারের ব্যবহার নেই। বাক্যের গঠন বিন্যাস ও অনুচ্ছেদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও সহজ সৌন্দর্য্য বিদ্যমান। বাক্য দৈর্ঘ্যও বৈচিত্র্যপূর্ণ, অর্থবিস্তারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ হয়েছে। বর্ণনার বিষয় নির্ভর করে অনুচ্ছেদগুলি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। প্রদত্ত তিনটি অনুচ্ছেদের প্রথমটিতে জোড়াদীঘির অত্যুচ্চ প্রতিমার বর্ণনা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রকান্ড মেলার বর্ণনা, তৃতীয় অনুচ্ছেদে নৌকার বহুবিচিত্র অবস্থার বর্ণনায় লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত। শিল্পী প্রমথনাথ এখানে তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরীতি

উপন্যাসের নায়ক উদয়নারায়ণ অন্ধ, বধির, চলৎশক্তিহীন বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নিয়ামক নক্ষত্রের জীবন ট্র্যাজেডি বিধৃত হয়েছে আলোচ্য বিশ্লেষণাত্মক গদ্যের নিম্নোক্ত অংশটিতে। লেখক মাত্র চারটি অনুচ্ছেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে চৌধুরী পরিবারের অবক্ষয়িত অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন —

" লোকটি অনেক কষ্টে, বহু চেষ্টায় চন্ডীমন্ডপে প্রবেশ করিল, একটি স্তিমিত শিখায়

ঘরের অন্ধকারটুকু কেবল দৃশ্যমান, লোকটি ধীরে ধীরে পথ হাতড়াইয়া আসিয়া প্রতিমা বিরহিত বেদীর মূলে প্রণাম করিতে গিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর্তকণ্ঠে ক্রন্দন ও অভিযোগের মাঝামাঝির স্বরে বলিয়া উঠিল — মা, মা, তুমি এবার আসনি ; সবাই আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে, আমি জেনে শুনে প্রবঞ্চিত হয়েছি — আমি জানি এবার চৌধুরীদের মন্ডপে তোমার পূজা হয়নি — আর কোন দিন হবে না । কত শত বৎসর পরে জানি না, এই প্রথম পূজা বন্ধ হল। কত শত ব্রহ্মহত্যা নরহত্যা করলে এমন পাপ হয়.....

মা, তুমি যখন চৌধুরীদের ছাড়লে, ক্রমে সবাই ছাড়বে, যে মন্ডপে তোমার পদার্পণ হল না, তার একটা ইটও থাকবে না। এই সবই আমি জানি।

..... এ তিনদিন তোমাকে যে প্রণাম করেছি, সে প্রণাম মিথ্যা, তোমার পায়ে তা পোঁছায়নি — তাই আজ তোমাকে সত্যি প্রণাম করতে এলাম ; জানতে এলাম যে আমি জানি, তুমি আসনি — আর কখন আসবে না। আমার অপরাধের গুরুত্ব আমি জানি না, তার মার্জনা আমি চাই না, শুধু এইটুকু আশীর্বাদ কর, যেন শেষ পর্যন্ত এই মিথ্যাটুকু বাঁচিয়ে রেখে মরতে পারি।''[৯]

— নায়কের এই আত্মানুশোচনা, আত্মবিশ্লেষণ ও খেদোক্তি কতটা মর্মস্পর্শী তা এই অংশে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। যুগাবসানের সঙ্গেসঙ্গে অতীত ঐতিহ্যবাহী দুর্গোৎসব কি করে বন্ধ হয়ে গেল লেখক তার সার্থক সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

চারটি অনুচ্ছেদে ঔপন্যাসিক একটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরীতির মাধ্যমে। ভাবপ্রবাহ ও অর্থগৌরবে নিটোল মূর্ত্তি রূপলাভ করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন লেখক।

প্রথম অনুচ্ছেদে নায়কের ঐক্যমুখীন সরলতায় প্রতিমা বিরহিত বেদীর মূলে প্রণাম

করে ক্রন্দনধ্বনি ও মায়ের কাছে অভিযোগ বর্ণনায় ব্যঞ্জনাধর্মিতা আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

দ্বিতীয় অংশে ভবিষ্যৎবক্তার মত সুদূরপ্রসারী ভাবপ্রবাহ ধ্বনিত হয়েছে। চৌধুরীদের প্রতিমাহীন চন্ডীমন্ডপের অস্তিত্ব, ধন, প্রাচুর্য যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও কালের কপোল তলে বিলীন হয়ে যাবে। সামন্ততন্ত্রের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের আগমনে কালের দ্বন্দ্ব আলোচ্য অংশে তুলে ধরেছেন লেখক।

সর্বশেষ অংশে শৌর্য বীরত্ব, ঐশ্বর্য, আড়ম্বর নয় মিথ্যে প্রণামের আড়ালে সত্যি প্রণামটুকু বেঁচে থাকতে চেয়েছে উদয়নারায়ণ। এখানে আশাবাদের সুর উচ্চারিত হয়েছে।

বাক্যের অর্থগত দিক, ছন্দগত ধ্বনিপ্রবাহ, চিত্রকল্পে লেখকের অ্যাটিচ্যুড বা মনোভঙ্গি সহজ, সুন্দর ও সুষমভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে যেভাবে তা লেখকের বিরল সৃষ্টি শক্তির পরিচয় বহন করেছে সন্দেহ নেই।

আবেগাত্মক গদ্যরীতি ঃ

" — শুধু — এই অনুরোধ, জানি অনুরোধের অধিকার আমার নেই — তবু বলছি ! তিলে, তিলে, পলে, পলে কারাগারের বিষাক্ত বায়ুতে আমাকে মরতে দিও না — যেমন ঐসব হতভাগ্য নরকঙ্কাল। তোমার ঘাতক আছে, সৈন্য আছে খড়্গ আছে, বন্দুক আছে — তারই এক আঘাতে, এক গুলিতে। শাস্তির মধ্যেও তারতম্য আছে ; দন্ডাদেশেও দয়ার স্থান আছে। মুহূর্তের দন্ড বিধানে তুমি কৃপা কর।

এই বলিয়া সে দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া বনমালার পায়ের কাছে পড়িল।"[১০]

— এখানে আবেগধর্মী ভাষায় গুপ্ত কারাগারে বন্দী পরন্তপের মৃত্যুচেতনা উপস্থাপিত করেছেন শিল্পী প্রমথনাথ। " দন্ডাদেশেও দয়ার স্থান আছে " — খন্ডিত এই বাক্যটি তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। এখানে আবেগ সৃষ্টিতে আলোচ্য সংলাপটি অনবদ্য।

' জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ' উপন্যাসের বাক্যগুলি ছোট, বড় ও মাঝারি তিন ভাবেই ব্যবহার করেছেন।

ছোট বাক্য ঃ

(ক) " তবে কি রে ? "

আজ্ঞে দেখছি ?"

(খ) " মূঢ় পরন্তপ একাকী দাঁড়াইয়া রহিল !"

(গ) " পরন্তপ শুধু বলিল — মুক্তি কেন ? " [১১]

(ঘ) " বিশাল দেউড়ি খুলিয়া গেল ! [১২]

প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি আকারে ছোট হলেও শিল্পগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

মাঝারি বাক্য ঃ

" তখন রাত্রি একপ্রহর অতীত হইয়াছে, আলিবর্দি সর্দার একটি মশাল হাতে করিয়া দেউড়ির দালানের উপর উঠিয়া কোম্পানীর ফৌজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ করা আমাদের ইচ্ছা নয়, সে শক্তিও নাই, আমরা দেউড়ি খুলে দিতে রাজী আছি, কিন্তু তার আগে সাহেবের কাছ থেকে জবান চাই বাড়ীর মধ্যে কোন অত্যাচার হবে না। " [১৩]

মাঝারি ধরণের বাক্যটি শেষ হয়েছে ছয়টি লাইনে, পাঁচটি কমার পর বিরাম চিহ্ন বসেছে।

বড় বাক্য ঃ

" যে বিধাতা মানুষ গড়ে, আমি তার সৃষ্টি নই ; যিনি গড়েছেন পাহাড় পর্বত, নদী সমুদ্র, অরণ্য কান্তার, আমি তারই রচনা ; মানুষের সংসারে আমি প্রক্ষিপ্ত ; আমি তারই

রচনা ; আমি লোকাতীত লোকোত্তর ; আমার শত্রু নাই, মিত্র নাই, আত্ম নাই, পর নাই ; আমার দ্বেষ নাই, প্রেম নাই ; আমার হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই ; আমি পুরুষ নই, নারী নই, আমি পাষাণী ! পাষাণের মত নিঃসঙ্গ, নির্জন, নির্জীব, নিস্তব্ধ ; বাসনার অতীত সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে; আমার প্রাণ নাই, কাজেই মৃত্যুও নাই ; আমি ভাল মন্দ, সৎ অসৎ কিছু নই ; আমার ন্যায় নাই। অন্যায় নাই ; সত্য নাই, মিথ্যা নাই ; আমি মানুষ নই, কাজেই মানুষের সম্পর্কটি আমার কাছে পরাঙ্মুখ ; আমি অলৌকিক আমি পাষাণী !"[১৪]

এখানে 'নাই ও 'নই' অব্যয় শব্দদ্বয় বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসে না বাচক অব্যয় পদের বহুল ব্যবহার করেছেন এরূপ আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(ক) " শীতের শান্ত চেহারা দেখিয়া তার বর্ষার প্রতাপ বুঝিবার উপায় থাকে না,"

(১৮০ পৃঃ)

(খ) যতদূর তাকাও মানুষ নাই, গ্রাম নাই, লোকালয়ের কোন চিহ্ন নাই ; (১৮০ পৃঃ)

(গ) " তা হলে তোমার আপত্তি নেই ?" (পৃ ২০৯)

(ঘ) " বাধা দিয়া কর্তা বলিলেন, মতিচুর পেয়েছিস-তা হলে রামজয় ফাঁকি দেয় নি;"

(ঙ) " ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন হইল — ইন্দ্রাণী তুমি কি আমায় ভালবাস না ?"

অতি সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর — না।" (পৃঃ ৩১৬)

সংলাপ ও বর্ণনা অংশে 'না' 'নাই' 'নই' 'নি' ইত্যাদি অব্যয় পদ প্রয়োগে লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত।

প্রমথনাথ আলোচ্য উপন্যাসে ধ্বন্যাত্মক শব্দের সুষম প্রয়োগ করেছেন এরূপ কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

ঝাঁ ঝাঁ, খস খস, টপ্‌টপ্, থম্‌থম্, ঠক্‌ঠক্, রীরী, ধীরেধীরে, পায়েপায়ে, তালেতালে,

গন্‌গন্‌, টুংটাং, টুকটাক, হুঁহুঁ, হাঁকিতে হাঁকিতে, পুঞ্জপুঞ্জ, কড়কড়, মৃদুমৃদু, দাউদাউ, ঝটপট, হাঃহাঃ ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

কিছু নূতন শব্দ বা এপিটোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিয়েছেন লেখক। যেমন —

স্নেহবিহীন অন্ধকার জীবন, মোহাচ্ছন্ন ঘৃণায়, অশ্রুহীন ক্রন্দনের বজ্রধ্বনি, নিরপেক্ষ ছাত্রবৎসল, শুঁড় শুদ্ধ সিদ্ধিদাতা গণেশ, খিঁচাইয়া, অনায়াস সুযোগ লব্ধ, বীর্যউদার, চন্দ্রসূর্যের পদচ্যুতি, ফুস ফুস ফাটা চীৎকার প্রভৃতি।

তৎসম শব্দ — মনোরমা, কুচমর্দিনী, মর্মরধবল, জ্যোৎস্নামন্ডল প্রভৃতি।

দেশী শব্দ — মট্‌কাইতে, ভোঁতা, গুতো, ঠেলা প্রভৃতি।

বিদেশী শব্দ — আলবোলা, গালিচা, তাকিয়া, বানিয়ান, কালেক্টর, পেট্রিয়টিক প্রভৃতি।

সমাসবদ্ধ পদ — বিদ্যুত্তাপে, প্রমাণকন্টকশূন্য, স্বপ্নশিল্পী, তরঙ্গবাহিনী, দীপালোকিত প্রভৃতি।

প্রমথনাথের নদীপ্রকৃতির লাবণ্যময় বর্ণনা কাব্যগুণ সমৃদ্ধ। প্রকৃতি মানবচরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তার অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন লেখক —

" পরদিন অতি প্রত্যুষে দর্পনারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে শয্যার উপরে জাগিয়া দেখিল বনমালা তখনও ঘুমাইতেছে। ..... সে বজরার ছাদের উপরে আসিয়া বসিল। শীতের কুয়াশা তখনও নদীর উপরে ও দুই তীরের মাঠের উপরে অতিসূক্ষ্ম মলমলের থানের মত বিলম্বিত ; নদীর জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কলধ্বনিই তার অস্তিত্বের প্রমাণ। দুই পাশের তীরে কুয়াশার মলমল বিদীর্ণ করিবার জন্য সুর্যের ভূমিশায়ী রশ্মিরেখা চেষ্টা করিতেছে ; আশে পাশের গাছপালার অস্পষ্ট আকার আলো ভীরু প্রেতাত্মার মত শঙ্কিত ভাবে কাঁপিতেছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্পনারায়ণের সর্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু জলকণায় আর্দ্র হইয়া গেল। সূর্যের কিরণ

প্রখরতর হইয়া উঠিল ; কুয়াশার মলমল অপসারিত হইতে হইতে দিগন্তের ধারে গিয়া ঠেকিল ; দুই তীরে তীব্র পীতবর্ণ সরিষার ক্ষেত প্রকাশিত হইয়া পড়িল ; সরিষার ক্ষেতের মদির গন্ধে বাতাস মন্থর, বাতাস ভাসিয়াই চলিয়াছে, দুই তীরের মাঠে কখন বা ছোলার কচি ক্ষেত, কখন কচি মশুরের, কখন বা কচি আখের ; শস্যের শ্যামল বর্ণ শিশিরের শুভ্র প্রলেপে ম্লানতর ; নদীতে তরঙ্গ নাই, মাঠে লোকজন নাই ; আকাশে মেঘ নাই, বাতাস যেন এখনো নিদ্রিত। সমস্তটা মিলিয়া দর্পনারায়ণের কাছে একটা স্বপ্নজগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।"[১৫]

দর্পনারায়ণের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পটভূমিকার গম্ভীর সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি প্রমথনাথের উচ্চাঙ্গের কবিত্ব শক্তির পরিচয় সন্দেহ নেই।

আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে মিথের ব্যবহারে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন লেখক। পুরাণ সচেতন শিল্পী ঘটনা বর্ণনায় স্থানে স্থানে মিথ কাহিনীর উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে শিল্পগুণের পরিচায়ক ঃ

" রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল তাতে রামায়ণ শেষ না হইয়া গিয়া আরও চারিটি কান্ডের সৃষ্টির কারণ হইয়াছিল; কিন্তু রাবণ যদি সীতাদেবীকে অসহায় দেখিয়াও হরণ না করিত, তবে রামায়ণ ঐখানেই শেষ হইয়া যাইত, সীতাদেবীর অহঙ্কারে যে আঘাত লাগিত তাতে তিনি পম্পা সরোবরে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। ছদ্ম নলদের মধ্য হইতে দময়ন্তী প্রকৃত নলকে বরমাল্য দান করিয়াছিল সত্য, কিন্তু দেবতাদের ছলনাতে তিনি মনে মনে খুশি হন নাই — এমন কথা জোড় করিয়া কে বলিতে পারে ?" [১৬]

ইন্দ্রাণী চরিত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এরূপ মিথের ব্যবহার নিঃসন্দেহে প্রশংসাতীত।

উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রমথনাথের শিল্প কুশলতার পরিচয় বহন করে। বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে, সাদৃশ্য আবিষ্কারের অভিনবত্বে, কল্পনার চমৎকারিত্বে, গুণগত উৎকর্ষে প্রমথনাথের

উপমাগুলো মূল্যবান সম্পদ।

পরিস্থিতি চিত্রণে উপমার ব্যবহার —

" বহুপরে কৌতূহলীর কোন অধস্তন পুরুষ হিমান্তের গুহানিহিত সর্পরাজির মত সেই অস্ত্রগুলিকে একদিন আবিষ্কার করিল।" পৃঃ ২৪

— উদয়নারায়ণ দীর্ঘাকৃতি বিরাট পুরুষ এরূপ বিরাট পুরুষের দল বাঙালীর ঘর থেকে লুপ্ত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পান্ডবভ্রাতার বহু অক্ষৌহিনী বিজয়ী মহা অস্ত্রগুলো যেমন প্রাচীন অস্ত্রশালার পাষাণ প্রাচীরের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লুপ্তপ্রায় বিরাট পুরুষদের মধ্যে উদয়নারায়ণ যেন বরফের গুহায় অবস্থিত সর্পরাজির মত অস্ত্রগুলি আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয়।

চরিত্রের স্বরূপচিত্রণে উপমার দৃষ্টান্ত ঃ

"ইন্দ্রানী অন্ধকারে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ছায়ার মত দাঁড়াইয়া রহিল।" (পৃঃ১৬৬)

— প্রদীপ হাতে চুপিসারে সুপুরুষ পরন্তপকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ ইন্দ্রাণীর হাতের প্রদীপটি মাটিতে পড়ে যাবার শব্দে ইন্দ্রাণী অন্ধকার নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা ছায়ার মত দাঁড়াল। ইন্দ্রাণীকে এখানে ছায়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

চরিত্রের রূপ চিত্রণে উপমার প্রয়োগ ঃ

"ইন্দ্রাণী গৃহের প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ" - রক্তদহের উত্তরাধিকারিণী ইন্দ্রাণীকে রক্তদহের রক্তকমল নাম রেখেছে উদয়নারায়ণ। ইন্দ্রাণী আকাশের তারার মতো সুন্দর এবং প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ চরিত্রের রূপ চিত্রণে উপমাটি সার্থক।

পুরাণাশ্রিত উপমাঃ

বহু পুরাণাশ্রয়ী উপমা উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে — যেমন

" কোথাও একটানা বহু বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র শস্যক্ষেত্র দ্রৌপদীর ক্রমবর্ধমান অঞ্চলের মত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছে, শেষ নাই চোখেরও ক্লান্তি নাই ; "

মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে শাড়ীর আচলের যেমন শেষ নাই তেমনি চলনবিলের তীরভূমিতে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা উত্তরবঙ্গের শস্যক্ষেত্রের তেমন দিগন্তবিস্তৃত এরূপ উপমা প্রয়োগ প্রমথনাথের কবিত্বগুণের পরিচয় বহন করে।

লেখক কাহিনী উপস্থাপনের সময় মাঝে মাঝে পাঠকদের সম্বোধন করে ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরেছেন যেমন —

" পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এ আবার কি ? ইন্দ্রাণী এত চিন্তা করিবে কি প্রকারে ?"

(পৃ ১৪৮)

লেখক কিছুটা হালকা চালে উপন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন —

" পাঠক, তুমি ভাবিতেছ — এ কি হইল ; তোমার গল্প পাঠের আগ্রহের পারদ দেখিতে দেখিতে নামিয়া একেবারে নৈরাশ্যের কোঠায় গিয়া ঠেকিয়াছে। .....। সত্য কথা বলিতে কি আমি তোমাদের ইতিহাস শুনাইব।" (৩৬ পৃঃ)

প্রবাদ প্রবচন ছড়া, গান উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন —

(১) "দয়া করে দেয় নুন,

ভাত মারে দশগুণ।" (১৬৭ পৃঃ)

(২) " বাংলাদেশের পক্ষে সপ্তদশ সংখ্যা শুভ নয়। " (৪১ পৃঃ)

(৩) "ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" (২৭২ পৃঃ)

(৪) " কথায় শুকনো চিরে ভিজে না, " (২৮৬ পৃঃ)

লৌকিক উপাদানের নিদর্শন ছড়াগান চমৎকারিত্ব দান করেছে ঃ

(ক) " ও গো বৈরাগী ঠাকুর

তোমার ঝুলি থেকে জল পড়ে টাপুর টুপুর।"

(খ) " কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম

দাঁত ছোলা, মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।"

এরূপ অসংখ্য ছড়াগান উপন্যাসকে আঙ্গিক নৈপুণ্যতা দান করেছে।

সংলাপের ভাষায় প্রমথনাথ অবিসংবাদী উৎকর্ষ সৃষ্টি করেছেন। ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের উপযোগী ভাষা প্রয়োগে লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত।

মিঃ বার্ড সাহেবের মুখের ভাষা —

" টুমি বিউনোপার্টের নাম শুনিয়েছ ?

আমি টাকে জয় করিয়েছি ।"

—ইংরেজ সাহেবের ভাষায় 'ত' 'কে' 'ট' উচ্চারণ চরিত্র উপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই।

উদয়নারায়ণের সংলাপ পৌত্র দর্পনারায়ণকে উদ্দেশ্য করে — " দাদা, তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফিরো ! অঘ্রাণ মাসেই কিন্তু রক্তদহের রক্তকমলকে ঘরে আনব। আর দেরী নয়।" (পৃঃ ৮৬)

— চরিত্রের উপযোগী সংলাপটি সার্থক।

এছাড়া ইন্দ্রাণী, বনমালা, দর্পনারায়ণ, পরন্তপ প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপ প্রয়োগে লেখক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

হাস্যরস পরিবেশনের জন্য বেঙা, আব্বর, বাণীবিজয়, পুঁটি গোয়ালিনী, রমেশ, ঢুলি,

চাঁপা প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রের উপযোগী মুখের ভাষার প্রয়োগনৈপুণ্যে সার্থক হয়েছে। বিকৃত অস্বাভাবিক চরিত্রের সংলাপগুলিও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

জীবন সম্বন্ধে অনেক স্মরণীয়, সূক্ষাগ্র মন্তব্য ' জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ' উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের পাতায় লেখকের স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কণ্ঠস্বর, উপদেশ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ সম্বোধন করে বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে নিজের মতামত ও বক্তব্যকে তিনি প্রকাশ করে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এমন দুএকটি মন্তব্য তুলে ধরছিঃ —

লেখক সমাজবিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা সত্য আবিষ্কার করেছেন —

" আদিম দম্পতি আদিম বনভূমিতে যে লীলা করিয়াছিল, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে আজিও সেই লীলা চলিতেছে। ..... আদিম দম্পতির সঙ্গে আধুনিক দম্পতির অনৈক্য নাই।" (পৃঃ ১২১)

— দর্পনারায়ণ বনমালাকে পরন্তপের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনবার পর — এই মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

" সোনা যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে তাকে যতই ঘস না কেন, আগুনে পোড়াও, অনাদরে ফেলিয়া রাখ, তা আরো সুন্দর হইয়া ওঠে — দুঃখ সুন্দরকে সুন্দরতর করিয়া তোলে। "

(পৃঃ ১৩৭)

— দর্পনারায়ণের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ স্থির হয়েও দর্পনারায়ণ বনমালাকে বিয়ে করায় ইন্দ্রাণীর মানস প্রতিক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে পাষাণ সুন্দরী ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্য্য যে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত সেই প্রসঙ্গে লেখকের এই মন্তব্যটি অনুপম হয়েছে সন্দেহ নেই।

" দেবতার পণ অপেক্ষা দৈত্যের পণ অনেক ভীষণ ! মিথ্যাবাদী যখন সত্য কথা বলে,

সে সত্যের একচুল এদিক ওদিক হইবার উপায় থাকে না ।" (পৃ ১৮৪)

— পরন্তপকে দর্পনারায়ণ অপমান করবার পর প্রতিশোধের নেশায় কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসে। দর্পনারায়ণকে দন্ড না দিয়ে সে সুরা ও নারী স্পর্শ করবে না। অথচ পরন্তপ ভ্রষ্টাচারী, সে বলপূর্বকভাবে বনমালাকে তাঁবুতে ধরে এনেছিল। পরন্তপের এই প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা পরবর্তীতে রক্তদহ ও জোড়াদীঘি গ্রামের মধ্যে বৃহত্তর দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল।

"বিধাতার হাতের চরম সৃষ্টি প্রকৃতি নির্দোষ নিখুঁত, আদর্শ। মানব বহুদোষাপন্ন, বহু ত্রুটি সমাকীর্ণ, পদে পদে খন্ডিত। মানুষ আপনার আগোচরে প্রকৃতায়িত হইবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনই মনুষ্যত্বের আদর্শ। কারণ নিঃসঙ্গ মানুষ অসম্পূর্ণ আর প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণা।" (পৃঃ ১৮৮)

- প্রকৃতির বিরাটত্বের কাছে মনুষ্য মহিমা নিষ্প্রভ। প্রকৃতির মহত্তমা মানুষকে শিক্ষা দেয়। মানুষ নিরন্তর প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে আগ্রহী কেননা প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণা কিন্তু মানুষ অসম্পূর্ণ ও নিঃসঙ্গ।

" সংসারে সুখ সুলভ না হইলেও দুর্লভ নয়, দুঃখ তো পদে পদে, কিন্তু আনন্দ!.... আনন্দের প্রকৃতি অদ্ভুত, তাহা সুখও নয়, দুঃখও নয়, সুখদুঃখ রোমন্থন - তাহা স্মৃতিসাগর। দুঃখের স্মৃতি আর দুঃখদায়ক নয়, সুখের স্মৃতিও সুখ দায়ক নয় তা আনন্দ।"

- মানুষ সুখের প্রত্যাশী - দুঃখ মানুষের কাম্য নয়। লেখক বলতে চেয়েছেন সুখ ও দুঃখের অতীত হল স্মৃতি, স্মৃতিতেই আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। ইন্দ্রাণী জীবনে সুখ পায়নি জীবনটা তার দুঃখময়। পিতৃহীনতার দুঃখ, দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিবাহ না হবার দুঃখ, পরন্তপের সঙ্গে বিবাহ হবার দুঃখ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় সে জীবনের রহস্য উপলব্ধি করেছে। সুখ নয়

জীবনের লক্ষ্য হল শান্তি। এরূপ অজস্র মন্তব্য উপস্থাপন করে উপন্যাসের গৌরবকে বাড়িতে তুলেছেন লেখক।

পরিশেষে বলা যায় কি কাহিনী গ্রন্থনে, কি অভিনব উপস্থাপন রীতিতে, চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয় সাধনে ও মহাকাব্যের উপযোগী রমণীয় ভাষা বিন্যাসে 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসটি নতুন আঙ্গিকের পরিচয় দান করেছে। উপন্যাসটির আঙ্গিক সাফল্য প্রমথনাথের শিল্প প্রতিভার নিদর্শন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় খন্ড

'চলনবিল'
উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

উপন্যাসের প্লট গঠনে চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি, পরিবেশের সঙ্গে স্টাইল ও জীবনদর্শন স্থান লাভ করে। উপন্যাসের শর্ত অনুসারে উপস্থাপনা কৌশল ও পরিবেশন নৈপুণ্যের উপর আঙ্গিক এর সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। ঘটনা বিন্যাসের পরিপাট্য ও শৃঙ্খলারক্ষা ঔপন্যাসিকের প্রধান কাজ - উপন্যাস সেটিং উপযুক্ত হওয়া চাই। কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে গ্রন্থন হয়েছে কিনা তার উপর উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে।

'চলনবিল' উপন্যাসের গঠনকৌশল আমাদের আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রমথনাথ মোট সতেরেটি পরিচ্ছেদে চলনবিল উপন্যাসের কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন এবং চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছেন। কাহিনী বৃত্তে ঘটনা ও চরিত্রের উপযুক্ত ভাবে বিন্যস্ত হয়ে ক্রমেই

পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

দর্পনারায়ণ ও তার তিন বছরের ছেলে দীপ্তিনারায়ণের ধুলোউড়ির কুঠিতে জীবন যাপনের কাহিনী দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চলনবিলের প্রাকৃতিক পরিচয় ও অতীত জীবনপ্রণালীর ইতিহাসের তথ্যভিত্তিক বর্ণনা দিয়েছেন, পূর্বসূত্র পরিচ্ছেদে উপন্যাসের অন্যতম নায়ক চলনবিলের ঋতুগত বৈচিত্র্য, ডাকাতি পরিচ্ছেদে গুরুদাসপুরের ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দর্পনারায়ণের সক্রিয়তা মূল বিষয়। পরন্তপের পূর্বকথা অংশে চাঁপার সঙ্গে পরন্তপের পরকীয়া প্রেম ও ইন্দ্রাণী কর্তৃক বিতারিত হয়ে পারকুল গ্রামে পরন্তপের ডাকাত সর্দার হবার ঘটনা। পরন্তপ ও ডাকুরায় অধ্যায়ে ডাকুরায়ের উপকারসূত্রে পরন্তপের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদে কুসমির সঙ্গে মোহনের বাল্য প্রেমের বর্ণনা ও দর্পনারায়ণের নেতৃত্বে বাঁধ নির্মাণ এবং চলনবিল এলাকায় গ্রাম পত্তনের চিত্র, একাদশ পরিচ্ছেদে দীপ্তিনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে দর্পনারায়ণের জোড়াদীঘিতে যাত্রার বিবরণ ও জমিদারীর ভগ্নাবশেষ দেখে ও অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে নৈরাশ্যবোধ মূল বিষয়, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মোহন ও কুসমির বেণীরায়ের কালীমন্দিরে শপথ গ্রহণ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পদ্মা ও যমুনার বানের বর্ণনা, চর্তুদশ পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন অনুসরণ এখানে কুসমিকে পরন্তপের কাছ থেকে উদ্ধারের ঘটনা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন পরিহাস এই অংশে কুসমি, চাঁপার সঙ্গে ধুলোউড়ির কুঠিতে যাত্রাকালে বৈষ্ণবীদের সঙ্গে পরিচিতির বর্ণনা আলোচিত ; ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদে চলনবিলের প্রলয়ঙ্করী বানে বাঁধের ভাঙ্গন ও দর্পনারায়ণের মৃত্যু মূল আলোচ্য বিষয়, সর্বশেষ পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন রুদ্ধদ্বার, এখানে কুসমির বৈধব্য ঘটনার প্রকাশ করে মোহনের সঙ্গে বিবাহের বাঁধার সৃষ্টি আলোচ্য বিষয়। প্লটের শ্রেণী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'চলনবিল' অর্গানিক প্লট।

উপন্যাসের কাহিনী ধারা বিশ্লেষণ করলে তিনটি কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায় (১) দর্পনারায়ণের সঙ্গে পরন্তপের পূর্ব শত্রুতা বহ্নির অর্ধস্তিমিত পর্যবসান ; (২) মোহন ও কুসমির কৈশোর স্বপ্নমধুর কিন্তু পরিণামে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত প্রণয়াকর্ষণের কাহিনী ; (৩) চলনবিলের সঙ্গে দর্পনারায়ণের নবোদ্রিক্ত শক্তি পরীক্ষার প্রেরণা ও এই অসম দ্বন্দ্বের মর্মান্তিক পরিণতি।

মোহন ও কুসমির উপকাহিনীটি মূল কাহিনীর পরিপূর্ণতা দান করেছে। প্রমথনাথ মূল কাহিনীকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য মূল কাহিনীর পাশাপাশি মোহন ও কুসমির উপকাহিনীটি উপস্থাপনা করে মূল কাহিনীকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। কাজেই 'চলনবিল' উপন্যাসের প্লট শিথিল ও সঙ্গতিহীন প্লট নয় তা দৃঢ়পিনদ্ধ হয়েছে। মনে হয় ঔপন্যাসিক প্লট বা বৃত্ত রচনায় মনোযোগী হয়েছেন সন্দেহ নেই।

লেখকের কাহিনী গ্রন্থনে চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র দর্পনারায়ণ, ছাড়াও প্রধান চরিত্র ডাকুরায়, পরন্তপ এবং পার্শ্বচরিত্র মোহন, কুসমি, ক্ষেন্তবুড়ি, চাঁপা, মুকুন্দ প্রভৃতি চরিত্রগুলি পরিস্ফুটনে কাহিনীধৃত ঘটনাবলী ও পরিবেশ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হতে পেরেছে। এককথায় বৃত্ত ও চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পুরোপুরি দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথ উপন্যাসের শুরু করেছেন দর্পনারায়ণ ও তার শিশুপুত্র দীপ্তিনারায়ণের শৈশবকালীন ছেলে ভুলানো গল্প দিয়ে। কাহিনীর সূচনায় ঔপন্যাসিক পিতা পুত্রের রমণীয় বাৎসল্য রসযুক্ত সংলাপ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন মোহন ও কুসমির বিচ্ছেদ বেদনা দিয়ে—

" মোহন অবিরল মাথা কুটিতে লাগিল আর অনর্গল উচ্চারণ করিতে লাগিল —

ভগবান, ভগবান, ভগবান .....

ভগবান, নিয়তি, অদৃষ্ট, শয়তান তোমাকে কী নামে ডাকিব জানি না, কেবল জিজ্ঞাসা করিতে চাই মানুষের জীবন লইয়া তোমার এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন ? সে তোমার পরিহাসের যোগ্য নয় ! তবে কেন ? তবে কেন ? কে উত্তর দিবে — তবে কেন ?'' [১৭]

মোহন ও কুসমির বিচ্ছেদ বেদনা ও মোহনের অদৃষ্ট বিড়ম্বিত ব্যর্থতার কাহিনী দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেছে।

উপন্যাসের গঠন বিন্যাসে সময়গত ঐক্য ও স্থানগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে সন্দেহ নেই। সময় বিন্যাস —

' চৈতালি উঠে গেল — বর্ষার জল আসবার আগে এরা অল্পদিনের মধ্যে একটা জলি ধান বা জ্যৈষ্ঠিধান ফলিয়ে নেয়। বৈশাখের শেষেই যমুনার জল এসে পড়ে', ' ক্ষেতের মধ্যে হাটু জল জমেছে আজ রাতেই ডুবে যায়।'

' বৈশাখের শেষে একদিন দর্পনারায়ণ সেখানে বিকাল বেলায় দাঁড়িয়েছিল' '' সে স্থির করেছে এবারে বর্ষার জল না ঢুকলে আগামী সালে ওখানে লোক বসবে''।

'' অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে দর্পনারায়ণ দীপ্তিনারায়ণের দীক্ষা দিন স্থির করেছে।''

— এখানে বর্ষা, আজ রাতে, বৈশাখের শেষে, বিকেল বেলায়, আগামী সালে, অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সবক্ষেত্রেই সময়ের প্রশ্ন যুক্ত । লেখক উপন্যাসের ঘটনাকাল তিন বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

স্থানগত ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রেও লেখক ছিলেন সচেতন ছোট ধুলোউড়ির কুঠি, গুরুদাসপুর, জোড়াদীঘি, কইজুড়ি গ্রাম, পারকুল গ্রামের মধ্যেই উপন্যাসের ঘটনা সীমাবদ্ধ। তবে ঘটনার বিস্তৃতি দানের জন্য বগুড়া জেলাকে লেখক উপন্যাসে স্থান দিয়ছেন।

আখ্যান গঠনের ক্ষেত্রে 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে' র সঙ্গে চলনবিলের পার্থক্য হল জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবাবের প্রতিটি অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত পরিচ্ছেদগুলি সংখ্যা নামে চিহ্নিত কিন্তু 'চলনবিল' উপন্যাসে তারকা চিহ্ন দিয়ে অনুচ্ছেদগুলিকে ভাগ করেছেন কোন সংখ্যা নামে চিহ্নিত করেন নি।

'চলনবিল' উপন্যাসে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ পরিকল্পনার দিক থেকে কোন সমতা রক্ষিত হয় নি। অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলি কোনটি ছোট কোনটি বড়। ত্রয়োদশ অধ্যায়টি ছয় পৃষ্ঠার, সপ্তদশ অধ্যায়টি সাত পৃষ্ঠার, সর্বশেষ অধ্যায়টি ছোট তিন পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেছেন। আবার চতুর্থ অধ্যায়টি আটত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেছেন। সুতরাং লেখক অধ্যায়ের দৈর্ঘ্যের সমতা ঠিকভাবে রক্ষা করেননি। পরিচ্ছেদগুলির সমদৈর্ঘ্যতা উপন্যাস গঠনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। 'চলনবিল' উপন্যাসের এটা একটা গঠনগত ত্রুটি।

উপন্যাসের গঠন বিন্যাসে বঙ্কিম ঐতিহ্য অনুসারী স্বপ্নদর্শন অথবা অদ্ভুত দৃশ্যপট ঘটনার পরিণতিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। বঙ্কিম চর্চিত অদৃষ্ট নির্ভর স্বপ্নদর্শনকে শিল্প আঙ্গিক হিসাবে বেছে নিয়েছেন শিল্পী প্রমথনাথ। উপন্যাসের কাহিনীধারায় তিনটি স্বপ্ন উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথম 'স্বপ্ন ধুলোউড়ির কুঠিবাড়ীতে তন্দ্রার ঘোরে বনমালা ও ইন্দ্রাণী দুজনের স্মৃতিমূলক স্বপ্ন দেখেছে দর্পনারায়ণ। " বন্যা যেমন সোনার পলি ফেলে রেখে এগিয়ে যায় তেমনি বনমালা আর ইন্দ্রাণী কত সোনার স্মৃতি ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিদ্যুত আর ইন্দ্রধনু দুই আকাশের তবু দুইয়ে কত প্রভেদ। বনমালা আর ইন্দ্রাণী দুজনেই শ্রেয়সী — তবু তারা কত ভিন্ন।"

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে ডাকুরায়ের স্বপ্নদর্শন উপন্যাসের রসসৃষ্টিতে অন্তরায় হয়

নি। " ঘরের মৃন্ময় দীপালোকের আবছা আলোতে এক সুন্দরী মূর্ত্তির করুণ রূপ দেখতে পেল — মূর্ত্তির ওষ্ঠাধর যেন নড়ছে।" এই স্বপ্ন দর্শনই পরবর্তীতে ঘটনাধারায় সুজনি ও কুসমিকে যে অভিন্ন তা আবিষ্কৃত হয়।

তৃতীয় স্বপ্নটি দেখেছে দীপ্তিনারায়ণ। কতদিন রাতে মাতৃমূর্ত্তিকেই স্বপ্নে দেখেছে সে। রজনী যেমন চুলখোলা অবস্থায় মুখ নত করে পৃথিবীকে কোলে নিয়ে বসে থাকে, তার চুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তারার মণিমানিক্য তেমনি মাতৃমূর্ত্তি যেন দীপ্তিনারায়ণকে আবৃত করে ধরেছে। অসহায় দীপ্তিনারায়ণ জন্মের পরেই যার মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল তার স্বর্গতাজননীরূপা মাতৃমূর্ত্তিটিকেই সে নিজের জননী বলে মনে করত।

উপন্যাসে দীপ্তিনারায়ণের এই স্বপদর্শন পাঠক মনে সমবেদনার সৃষ্টি করে উপন্যাসের রসসৃষ্টির সহায়তা করেছে।

আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে কিংবদন্তীকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন লেখক। বেণীরায়ের জাগ্রতা কালীমন্দিরে দেবীর কাছে মানত করলে তা নিষ্ফল হয় না, মন্দিরে এসে শপথ করে শপথ ভঙ্গ করলে তা মহা অমঙ্গলের কারণ হয় এরূপ সংস্কার ও বিশ্বাস উপন্যাসের একটি লৌকিকতার নির্দশন।

আঙ্গিক বা গঠনরীতির ক্ষেত্রে ছড়া, গান প্রভৃতি লৌকিক উপাদানকে উপস্থাপন করে রসশিল্পের পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনী অংশে লেখকের এই টেকনিক উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে — দু একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শিবচন্দ্র 'চট্টোপাধ্যায়' উপাধির পরিবর্তে মৈত্র উপাধি ধারণ করলে বিদ্রূপাত্মক ছড়া —

" খাটো খাটো ঠাকুরটি গলায় রুদ্রাক্ষের মালা

গাই গোত্র কিছু নাই, রাজীব রায়ের শালা।" [১৮]

ডাকু ও পরন্তপ মদ্যাসক্ত। মদ্যপান করে ডাকু গুণগুণ করে গান ধরল—

" নাকের নীচে গোঁফ রয়েছে কাঠাল গাছে ফল

কলুর বাড়ি লাগল আগুন তেল কোথায় বল।"

দুজন প্রৌঢ়া বৈষ্ণবী গলা মিলিয়ে খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইছে—

" গগণে পূর্ণিমা চাঁদ নদীয়ায় উদয় গো

তার নাইকো তিথি নাইকো অন্ত

নাই কভু বিলয় গো।"

এরূপ অসংখ্য ছড়া, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদের সংযোজন করে উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্যকে বাড়িয়ে তুলেছেন। আখ্যানগঠনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য লেখকের এই কৌশল নিঃসন্দেহে প্রশংসাতীত।

'চলনবিল' উপন্যাস পর্যালোচনা করলে আখ্যায়িকার নাট্যগুণ অনুভব করা যায়। নাটকীয় সিচুয়েশন সৃষ্টিতে প্রমথনাথের সাফল্য প্রশংসাতীত। সাধারণত চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই গতিময়তা, আকস্মিকতা, চমক সৃষ্টি হয়। নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও গতিময়তা উপন্যাসের প্রধান যা কাহিনীর গতিপথ পরিবর্তন করে ক্রমেই পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উপন্যাস থেকে এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

কুসমিকে পরন্তপ অপহরণ করে তার গৃহে আনবার পর কুসমির আত্মসম্মানে আঘাত হানবার জন্য তার পাশবিক হাত দুটো যখন এগিয়ে এল উৎকট আনন্দে যখন পরন্তপ স্বয়ং শয়তানের অট্টহাস্যে মুখরিত সেই মুহূর্তে —

"কুসমি তার মন ভিজাবার উদ্দেশ্যে বলল— আমি আপনার মেয়ের সমান।

পরন্তপ বলল — সেই জন্যেই তো এনেছি, নইলে এত কষ্ট করে কি আমার দিদিমাকে আনতে যাব।

কুসমি বলল — আপনি আমার পিতার সমান।"

— এই অংশে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠায় ঘটনার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে পাঠক অজ্ঞ। কি হবে, কি হতে পারে — এরূপ উত্তেজনায় পাঠক মন উদগ্রীব।

উপন্যাসটি ট্র্যাজেডিলক্ষণাক্রান্ত, উপন্যাসটিতে যে ট্র্যাজিক সংঘাত ঘনীভূত হয়েছে তা হল মানসিক সংঘাত — ব্যক্তির সঙ্গে সমাজজীবনের নীতিগত সংঘাত উপজীব্য হয়ে উঠেছে নিম্নোক্ত অংশে। মোহন ক্লান্ত দেহে এসেছিল কুসমিদের বাড়িতে রুদ্ধ দ্বার খুলে দেবার পর মোহন চমকে উঠল। সে দেখল কুসমির পরনে সাদা থান, চুলগুলো ছোট করে ছাটা, অলঙ্কারহীন অঙ্গ ও প্রশান্ত বিষাদ মুখখানা দেখে বিস্মিত হল সে —

ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে কুসমি বলল — ' মোহনদা আমি বিধবা।" [১৯]

— এই অংশে একদিকে যেমন নাটকীয়চমক অপরদিকে মোহন ও কুসমির নাট্যদ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াটি বেদনাবিধুর সন্দেহ নেই।

'চলনবিল' উপন্যাসে মিথের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রমথনাথ বিশী উপন্যাস কাহিনীতে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এরূপ মিথের ব্যবহার উপন্যাস গঠনের একটি বিশেষ অঙ্গ। দূর অতীতের প্রতি আকর্ষণের সূত্র ধরেই মিথের ব্যবহার হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল —

" আসল ভীমের পরিবর্তে লোহ ভীমই বা মন্দ কি ?"

ঔপন্যাসিক মহাভারতের এই দৃষ্টান্তে স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া পরন্তপের কাছ থেকে মুক্ত হবার জন্য কুসমির দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিঃসন্দেহে মিথের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার সঙ্গতিপূর্ণ সন্দেহ নেই।

স্থানে স্থানে লেখকের মন্তব্য উপদেশ গল্পকথকের মত লেখকের উপস্থিতি, কোথাও কোথাও জীবন সমীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যবান ও ভাবগর্ভ বক্তব্য উপন্যাসকে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ করে তুলেছে। প্রমথনাথের উপন্যাসের আঙ্গিকের এ একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এরূপ দৃষ্টান্ত উপন্যাসে অজস্র ছড়িয়ে আছে। নিম্নে তার কয়েকটি হীরকোজ্জ্বল উদ্ধৃতি প্রদত্ত হল ঃ

" মানুষে ভালবাসার পাত্রকে প্রতি দৃষ্টিতে নূতন করে আবিষ্কার করে, প্রেমে যে অভাবিতপূর্ণতা আছে, তাতেই প্রণয়াস্পদকে কখনো পুরনো হতে দেয় না, নদীর স্রোতের মতো প্রেম প্রতিমুহূর্তে নূতন, পুকুরের বাঁধা সীমানার বদ্ধ জল সে নয়।" [২০]

পত্নীহারা দর্পনারায়ণের একমাত্র সান্ত্বনা শিশুপুত্র দীপ্তিনারায়ণ। প্রতিনিয়ত শিশুর সরল সুকুমার কৌতূহলী মন তাকে আরও নিবিড়ভাবে ভালবাসা জাগিয়ে তোলে। সেই তো চৌধুরী পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকার। দর্পনারায়ণের স্বপ্নকে একমাত্র এই শিশুপুত্রই বাস্তবায়িত করতে পারে। মন্তব্যটিতে সন্তানবাৎসল্য প্রকাশিত হয়েছে।

" সংসারে কেউ শত্রু বা আপন হয়ে জন্মায়না — ব্যবহারে আপন পর হয়।" [২১]

ডাকুরায়ের সঙ্গে ক্ষেন্তবুড়ীর কথা প্রসঙ্গে ক্ষেন্তবুড়ীর জবানীতে এই বাস্তবসত্য উক্তিটি বর্ণিত। সংসার জীবনে ব্যবহারই হল শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শত্রু ও মিত্র আপন ও পর ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে।

" নারীত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তারা পুরুষের চোখের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা লাভ করে, কিংবা ঐ ক্ষমতাটি যখন লাভ করে, বুঝতে হবে তখনই তাদের নারীত্বের উন্মেষের

অরুণোদয়।'' [২২]

— দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনে শকুন্তলা যেমন তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল কিংবা কীচকের প্রথম দর্শনে যেমন দ্রৌপদী তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল ঠিক তেমনি কুসমি পরন্তপের লুব্ধ দৃষ্টি বুঝতে পেরেছিল। কুসমির নারীত্বের উন্মেষ ঘটেছে — কাজেই তার বিচার করবার ক্ষমতার অভাব ঘটে নি।

'' ধীরত্ব বীরত্বের সহায়ক'' (১৮১ পৃঃ) দর্পনারায়ণ দীপ্তিনারায়ণকে তার প্রকৃত শত্রুকে জানতে চাইলে কিশোর দীপ্তিকে সে বিষয় বোঝাবার সময় আসে নি, তাকে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। প্রকৃত বীর তিনিই যিনি ধীর পদক্ষেপে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে কাজ করেন।

উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণে উপস্থাপন কৌশল উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। প্রমথনাথ উত্তমপুরুষে চরিত্রের জবানীতে অর্থাৎ চরিত্রের দৃষ্টি কোণ থেকে গল্প পরিবেশন করেছেন।

(ক) ''মোহন বলল — তোর যাকে খুশি বিয়ে করগে, আমি কি জানি !'' [২৩]

(খ) '' ডাকু বলল — তাহলে তুমি এগিয়ে যাও বাবা। আর গিয়ে তোমার বাবাকে আমার নমস্কার আর কুঠিবাড়ির চৌধুরীবাবুকে আমার প্রণাম জানিও, তাদের বলো যে এতদিন আমি শয়তানের সঙ্গে ছিলাম বলে দেবতার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি নি। আমরা আজ বিকাল বেলায় নৌকা খুলে দিলে কাল ভোরবেলার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারব না — বড় নৌকা, ধীরে যাবে।''

(গ) '' কুসমি বলিয়া চলিল — তাহার কণ্ঠস্বরে জীবিতের কণ্ঠস্বরের মূর্ছনার অভাব, সে বলিয়া চলিল — মোহনদা, যে ঘরে আমি মানুষ সে আমার ঘর নয়, আমার মাতা কে, পিতা কে, আমার বংশ বাড়ি ঘর কেউ জানে না। শুধু নিশ্চিত এই যে আমি বিধবা।'' [২৪]

ঔপন্যাসিক এখানে নিজেকে আড়ালে রেখে বিধাতা পুরুষের মত গল্প পরিবেশন করেন। তিনি নিজে কোন চরিত্র নন। উপরোক্ত চরিত্রগুলির সংলাপে 'আমি' র ব্যবহার করেছে এরূপ উত্তমপুরুষে লেখক কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন।

লেখকের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাধর্মী চিত্ররূপ অঙ্কনে যথার্থ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। অপরূপ কল্পনার সাহায্যে ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন যেমন ঃ

"বাঁশির করুণ সুর রাত্রির অন্ধকার বনস্পতিকে আশ্রয় করে সোনার রঙের আলোকলতার আবছারূপ স্পর্শ তারাগুলোতে জড়িয়ে লাগে - নইলে সেগুলো এমন শিউরে শিউরে উঠবে কেন?"

এখানে পরিবেশ বিন্যাস রীতি ও কাব্য সৌন্দর্য্য অনন্যতা দান করেছে।

প্রমথনাথ চলনবিল উপন্যাসে চলিত ভাষার মাধ্যমে সংলাপ অংশ উপস্থাপিত করেছেন। নিম্নোক্ত সংলাপটি চলিত রীতিতে লেখা —

" মোহন বলল — তা নয় ।এখন বড় হয়েছিস কি না তাই।

কুসমি বলে — তাইতো আরো দূরে এসেছি। তাছাড়া বড় হয়েছি সে কি আমার অপরাধ। ওটা তো আমার হাতে নয়।

মোহন বলে — অপরাধের কথা কে বলছে ? তোর দেখা পাইনে তাই বুঝছি কুসমি এমন বড় হয়েছে।

কুসমি বলে — দেখা পাবে কি করে ? "

সংলাপ অংশটি চলিতভাষায় উপস্থাপিত। বর্ণনা অংশে কোথাও সাধুরীতি আবার কোথাও চলিত রীতিতে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

সাধুরীতি — " বিল ও কুঠি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লের মতো পরস্পরের দিকে ক টাক্ষ

করিয়া বসিয়া আছে।" এখানে করিয়া, বসিয়া সাধুরীতির ক্রিয়াপদ।

বর্ণনা অংশে চলিত রীতি —

" বিনিদ্র কুসমি শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে স্বপ্ন দেখলে যেন সে একটা সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের এক মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর অপর দিকে, অনেক দূরে, শয্যায় কে যেন শুয়ে আছে।" [২৫]

বর্ণনা অংশে লেখক মিশ্র রীতির প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এরূপ দুধরণের রীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন শিল্পী প্রমথনাথ।

চলনবিল উপন্যাসের উপমার যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। তবে 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের তুলনায় এখানে উপমার বাহুল্য নেই।

পরিস্থিতি চিত্রণে উপমার প্রয়োগ ঃ

" তার মনে হল নৌকার অন্ধকার হঠাৎ যেন গায়ে হলুদের রঙে রাঙা হয়ে উঠল— নৌকায় ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল—অনেক রাতের চাঁদে হলুদ ভাঁটা একটি নৈবেদ্যের মতো আকাশের কোলে উঠেছে।" [২৬]

— এখানে নৌকার অন্ধকার তার কাছে গায়ে হলুদের রঙে রাঙার সঙ্গে তুলনীয় এবং অনেক রাতের চাঁদকে 'হলুদ বাটা নৈবেদ্য' পরিস্থিতি চিত্রণের এক অনবদ্য উপমা।

চরিত্রের স্বরূপ চিত্রণে উপমা ঃ

" কুসমির চোখ দুটোও জ্বলছে, শিউলি ফুলের শিশির বিন্দুর উপরে আলোর মতো।"

মোহন প্রচন্ড আঘাত পেলে মোহনকে দেখতে এসেছে কুসমি — সেই মুহূর্তের কুসমি চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কুসমির চোখ দুটো জ্বলছে শিউলি ফুলের শিশির বিন্দুর উপরে আলোর সঙ্গে তুলনাটি অনন্যতা দান করেছে।

চরিত্রের রূপচিত্রণে উপমার প্রয়োগ ঃ

" কচি কচি হাতের মুঠি দুখানা দুই স্তবক জুঁই ফুলের মতো শয্যার উপরে অযত্নে বিন্যস্ত ; "

— এখানে শিশু দীপ্তিনারায়ণের শিশুসুলভ কচি কচি হাতের সঙ্গে জুঁই ফুলের স্তবকের তুলনা করেছেন লেখক।

প্রকৃতি বিষয়ক উপমা ঃ

" তার তন্দ্রার মেহগনি ফ্রেমের মধ্যে বনমালার আর ইন্দ্রাণীর স্থলপদ্মের মত কচি মুখ দুখানি দিব্য মাকুর মতো পর্যায়ক্রমে ছুটাছুটি করে স্মৃতির রেশমী বসন বুনতে থাকে। বন্যা যেমন সোনার পলি ফেলে রেখে এগিয়ে যায় — তেমনি বনমালা আর ইন্দ্রাণী কত সোনার স্মৃতি ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।"[২৭]

— এখানে ইন্দ্রাণী ও বনমালার স্মৃতিমূলক উপমাটি অনবদ্য।

লেখক মাঝে মাঝে পাঠকদের উদ্দেশ্যের কাহিনী বিষয়ক ইঙ্গিত প্রদান করেছেন —

" এবারে পাঠক এই কাহিনীর পূর্বতন এক পরিচ্ছেদের ঘটনা স্মরণ করলে উপস্থিত পাত্রপাত্রীগণ যে পরিচয় বিভ্রান্তিতে পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবেন।"

উপন্যাসের বাক্যগুলো কোনটি বড়, কোনটি মাঝারি আবার কোনটি ছোটআকারের ।'

ছোট বাক্য ঃ

" এই বলে সে মাকে প্রণাম করে পদধুলি নিল।"

সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যটি পূর্ণতা দান করেছে।

মাঝারি শ্রেণীর বাক্য ঃ

" দর্পনারায়ণের অনন্তবেদনামথিত কণ্ঠস্বর যেন কোন অতল গহ্বর হইতে উঠিতেছিল,

সেই স্বরগ্রামে নির্জনকক্ষের বায়ুমন্ডল মন্দ্রিত হইতে লাগিল — সমস্ত অট্টালিকা যেন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে, সমস্ত অট্টালিকা যেন পুত্রের উত্তর শুনিবার আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া — অপেক্ষা করিতেছে।"

— বাক্যটিতে দুটি কমা ও দুটি ড্যাস চিহ্নের পর বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

বড় ধরণের বাক্য ঃ

" মোহন ও কুসমি লাগালাগি দেহে পাশাপাশি শায়িত — ঊর্ধ্বে, অতিঊর্ধ্বে ছাড়া পাওয়া নীলকণ্ঠের মতো নীলাভ্র আকাশ — নীচে পৃথিবীর নিবাবরণ বক্ষ ; উপর থেকে ঝরছে গলিত লাভার মতো রোদ, নীচে থেকে উঠছে পৃথিবীর তপ্ত প্রশ্বাস আর প্রত্যেক নিঃশ্বাসে যেন ফুলের নিবিড় মধুবিন্দু শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে পড়েছে ; একটা প্রজাপতির পাখা দুটো মুদিত হচ্ছে আর খুলছে, চোখের ইসারায় যেন কিছু বোঝাতে চায়,

ঘুঘুটা এখনো ডাকছে, দূরে একটা কু কো পাখি হঠাৎ কয়েকবার কুক, কুক, কুক করে উঠল।" [২৮]

— বাক্যটিতে দুটি ড্যাস, দুটি সেমিকোলন, সাতটি কমা চিহ্নের পর বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

চলনবিল উপন্যাসের ধ্বন্যাত্মক শব্দ — ঝুরঝুর, ঝরঝর, ফরফর, কুক কুক, ছপাত ছপাত, ছলাত ছলাত, টিপটিপ, হিসহিসানি প্রভৃতি।

নতুন শব্দ — ভঢ়ং, টুঙ্গি, খোঁটা, চোঙা, জটাই প্রভৃতি।

অব্যয়ের ব্যবহার — ' বুঝতে পার না ? ' " হুজুরের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবার সাহস তারনেই।' 'জানতাম না'

এখানে না, নাই ইত্যাদি অব্যয় পদের সার্থক ব্যবহার করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় 'চলনবিল' উপন্যাসের গঠননৈপুণ্য, উপস্থাপন রীতি, ভাষা বিন্যাস, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক উদ্‌ঘাটন, সংলাপ নৈপুণ্য প্রভৃতিতে এক অভিনব আঙ্গিকের সমন্বয় করেছেন।

তৃতীয় খন্ড

'অশ্বত্থের অভিশাপ'
উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

উপন্যাসের প্লট, চরিত্র, উপস্থাপন কৌশল ও ভাষা শৈলীর উপর আঙ্গিক বিশ্লেষণ নির্ভর করে। 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ীর তৃতীয় খন্ড 'অশ্বত্থের অভিশাপ' এর কাহিনী ৮ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ১২ টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬টি, তৃতীয় অধ্যায়ে ১৬টি, ৪র্থ অধ্যায়ে ৮ টি, পঞ্চম অধ্যায়ে ৮ টি পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৫ টি, সপ্তম অধ্যায়ে ১২ টি এবং সর্বশেষ অষ্টম অধ্যায়ে ৪ টি পরিচ্ছেদ নিয়ে উপন্যাস সেটিং হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে গ্রন্থিত হয়েছে। উপন্যাসের প্লট বৃত্ত বিশ্লেষণ করলে কাহিনীর তিনটি খন্ডাংশে (১) নবীননারায়ণ ও মুক্তামালার কাহিনী (২) কীর্তিনারায়ণ ও রুক্মিণীর কাহিনী (৩) টোলের ছাত্র শশাঙ্ক ও বাদলির প্রণয় কাহিনী। উপন্যাসে দুটি মূল কাহিনীর সঙ্গে শশাঙ্ক ও বাদলির উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে।

উপন্যাসের মূল বিষয় শরিকি বিবাদ এই দশ আনির জমিদার নবীননারায়ণ সঙ্গে ছয়আনির জমিদার কীর্তিনারায়ণের দ্বন্দ্ব। প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষটিই এই কাহিনীর যথার্থ নায়ক। কর্তিত অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে ঘটেছে অসংখ্য চাঞ্চল্যকর কাহিনী লাঠিয়ালে লাঠিয়ালে লড়াই

এছাড়া কূটনীতি, আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য, গ্রাম্য দলাদলি, সংস্কার, বিশ্বাস, ভূমিকম্পের ফলে জোড়াদীঘির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি ঘটনাধারা। মহামুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ের নবম পরিচ্ছেদে কীর্তিনারায়ণ ও নবীননারায়ণের দুই পক্ষের মৃত্যুপণ দাঙ্গা হাঙ্গামায় এর পর ভূমিকম্পের ফলে জমিদারীর ধ্বংসস্তূপ উপন্যাসকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছে। কাহিনীধারা বিশ্লেষণ করলে এই উপন্যাসের প্লট জটিল। ঘটনার মালা দিয়ে সাজান জটিল প্লট উপন্যাসের লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ওঠে নি। উপন্যাস গঠনে কোন আঙ্গিক শৈথিল্য নেই।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের শুরু হয়েছে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা দিয়ে যে বৃক্ষটি প্রকান্ড ও প্রাচীন বহু ডাল পালা বেষ্টিত। উপন্যাসের পটভূমি গড়ে উঠেছে এই গাছটিকে কেন্দ্র করে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে উক্ত গাছটিকে দেবতার মর্যাদা দান করেছে জোড়াদীঘির গ্রামের বাসিন্দারা। সুদীর্ঘকালের সংস্কার ও বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভয়, আনন্দ প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনচক্র আবর্তিত অশ্বত্থবৃক্ষকে কেন্দ্র করে।

লেখক উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন অতীত ঐতিহ্যবাহী অশ্বত্থের গুঁড়ির কাছে তরুণ বংশধর রূপে সতেজ, সরল, উন্নত তরুণ চারাগাছের রক্তাভ পত্রের বর্ণনা দিয়ে। প্রমথনাথ নতুন চারাগাছকেএকটা নতুন যুগের ইঙ্গিত রূপে চিহ্নিত করেছেন। কাল প্রবাহে প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হয় জল স্থলে, স্থল জলে পরিণত হয় নতুন বৈচিত্র্য নিয়ে নবতন জীবনযাত্রা শুরু হয়। সমাজজীবনের পরিবর্তনও প্রাকৃতিক পরিবর্তনে প্রবল প্রতাপান্বিত — চৌধুরী বংশের জীবনধারা পাল্টে যায় — জোড়াদীঘির জীবনধারা স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়। লেখক উপন্যাসের প্রারম্ভের সঙ্গে পরিসমাপ্তিকে একটা ঐক্যসূত্রে গাঁথতে পেরেছেন সুকৌশলে।

মহাকাব্যিক উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে অসংখ্য পার্শ্বচরিত্রের মিছিলে একটা

যুগের বৃহত্তর জীবন রাগিণী বেজে উঠেছে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নবীননারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ এই দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নায়েব, জমানবিশ, লাঠিয়াল, পাইক, বরকন্দাজ, টোলের শিক্ষক, পুরোহিত, আমলাদের প্রতিনিধিরূপে দারোগা, মোক্তার, উকিল, মুহুরী, চাপরাশী প্রভৃতি শ্রেণীচরিত্র উপন্যাসের মূল চরিত্রের ঘটনাধারাকে পরিচালিত করেছে। পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে যোগেশ, পঞ্চানন, বদ্রীনাথ, নীলাম্বর, শশাঙ্ক, ভজহরি, আবেদ আলি, তারিনীবাবু, জহিরুল্লা, লালু, কালু, হরিচরণ এবং নারীচরিত্র মুক্তামালা, রুক্মিণী, অম্বিকা দেবী, লক্ষ্মী, মোতির মা, বাদলি, ছুতার বৌ, ছ আনির তরফের পুরাতন ঝি প্রভৃতি বাস্তব চরিত্রের উপস্থিতি উপন্যাসের মূল কাহিনীকে দৃঢ়পিনদ্ধ করে তুলেছে। উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনায় চরিত্রগুলির বিশেষ উপযোগিতা আছে সন্দেহ নেই।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের স্থানগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। মূল ঘটনাধারা আবর্তিত হয়েছে জোড়াদীঘিকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষটি ছিল ঘটনাধারার নীরব সাক্ষী। তবে সুদূর কলকাতা থেকেও জোড়াদীঘি গ্রামের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হলেও স্থানগত ঐক্যের ব্যত্যয় ঘটে নি। প্রমথনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে ঘটনার স্থানগত ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছেন।

উপন্যাসের আঙ্গিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সময়চেতনা। সময়গত ঐক্য রক্ষা উপন্যাস শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য দিক। কাহিনীধারা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও সময় সম্পর্কে ঔপন্যাসিক সচেতন। কাল বিন্যাসের উপকরণের অভাব নেই ঃ

" পদ্মার চরে বিকালবেলা নবীন ও মুক্তামালা বেড়াইতে গিয়াছে। এই চরটাই ছিল তাহাদের সান্ধ্যভ্রমণের 'স্থান। এখন শীতকালে নদী পার হওয়া কঠিন নয়।" [২৯]

এখানে শীতকাল, সান্ধ্যভ্রমণ, বিকালবেলা প্রভৃতি সময় বিন্যাস নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পদ্মাতীরে বালুচরে নায়ক নিবিড় সান্নিধ্যে প্রণয় ব্যাকুলতা গাঢ় সংবেদন সৃষ্টি

করেছে সন্দেহ নেই।

" শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশা জমা নিঃশ্বাস রোধী অন্ধকারে অট্টালিকার বিদীর্ণশিখরে বসিয়া হুতুম পেঁচা গম্ভীর আওয়াজের হাতুড়ি ঠুকিতে থাকে।"

— জোড়াদীঘিতে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত শীতের সন্ধ্যায় জীর্ণ অট্টালিকার রহস্যময়তা চিত্রিত করেছেন সময়ের দর্পণে।

" প্রত্নতাত্বিকরা বলেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে জোড়াদীঘির উপর দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত ছিল। ... যে তুলিতে একদিন জোড়াদীঘি সৃষ্টি হয়েছিল সেই তুলিতে আবার সব মুছিয়া গেল ..... এমনভাবে আবার কত শত বৎসর চলিবে।" [৩০]

আলোচ্য অংশে লেখক জোড়াদীঘির অতীত ও ভবিষ্যতের দূরতর কালস্তরকে — পাঁচ হাজার বছর আগে কিংবা " কত শত বছর পরে " গূঢ় চেতনার পটে আভাসিত করেছেন।

" আমরা যখন এই কাহিনীর সূত্রপাত করি, তখন ছিল কার্ত্তিক মাস, শীতের প্রারম্ভ ; তারপরে দীর্ঘ শীতকাল অতিক্রম করিয়া আমরা গ্রীষ্মের পুরোভাগ চৈত্র মাসে আসিয়া পৌঁছাইয়াছি। "

— এখানে কার্তিক মাস, চৈত্র মাস প্রভৃতি পরিবর্তমান মুহূর্তকে কথাসাহিত্যের অন্যতম রূপকার প্রমথনাথ উপন্যাসের সময় বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সংবেদী পাঠকমনে সমগ্রতাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসে পত্রের অবতারণা বিশেষ আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। জমিদার নবীননারায়ণের কলকাতা থেকে পাঠানো পত্রে তার জোড়াদীঘিতে আগমন সংবাদ পেয়ে বদ্যিনাথ, যোগেশ ও পঞ্চানন সুকৌশলে জোড়াদীঘিতে মহামারীর প্রারম্ভ জানিয়ে যে পত্রটি পাঠিয়েছে তা কাহিনীর গতিকে

অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

লেখক ছড়াগান, মিথকাহিনী ও গীতার শ্লোক উপন্যাসে শিল্পকুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

হরু ও শশাঙ্ক নেশার ঘোরে কথোপকথন কালে শশাঙ্কের কণ্ঠের গানটি চিত্তাকর্ষক — সংসার বৈরাগ্যের সুর উচ্চারিত —

" না লাগে টাকাকড়ি, না লাগে ধন ,
বাবা ব্যোম, বাবা ব্যোম !
না লাগে দয়ামায়া, না লাগে মন ,
বাবা ব্যোম, বাবা ব্যোম ।" [৩১]

নীলাম্বর ঘোষ সেকালের পৌরাণিক ঘটনা ও গীতার ব্যাখ্যা বিখ্যাত লাঠিয়ালে লাঠিয়ালে সংঘর্ষের প্রাক্কালে উচ্চারণ করেছেন। দুর্যোধন পান্ডব পক্ষের বীরগণের নাম দ্রোণাচার্যকেবলেছেন -

" অত্রশূরা মহোস্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চমহারথঃ।"

দুই জমিদারের দাঙ্গা যেন ধর্মক্ষেত্রে এই মুক্তি পঞ্চু, যদুমল্ল, মালঞ্চির সেখ প্রভৃতি যোদ্ধাগণের আগমন। আসন্ন লড়াইএর পূর্বমুহূর্তে নীলাম্বরের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন সুন্দরভাবে।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসটি নাট্যগুণ বিশিষ্ট। দুই জমিদারের লাঠিয়ালে লড়াই কতটা নাট্যধর্মী নিম্নোক্ত অংশটিতে তাঁর পরিচয় মেলে -

" ও কার লাঠি গেল ?"

" তেওয়ারীর!"

" ঠিক হয়েছে বেটা রাজপুত কিনা।"

" দেখে দেখো - আবেদের আস্পর্ধা দেখো ও যাচ্ছে মিলন সর্দারকে আক্রমণ করতে।"

"ইস ওই দেখো ভাই, কালু মাথায় চোট পেয়েছে, একেবারে বসে পড়লো।"

" ও কে পড়লো - ইদ্রিস না?"

" ওই দেখো - আবেদ আর সর্দারের লেগে গিয়েছে।'

ঠক্‌ঠক্ - ঠক্‌ঠক্।

"মরলো মরলো, আবেদ এবার মরলো।"

ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দুকের শব্দ হইল, পর মুহূর্তেই মিলন সর্দারের দেহ মাটিতে পড়িল।"[৩২]

লাঠিয়ালের এই মৃত্যু পণ লড়াই নাট্যধর্মী। এছাড়া বাদলির প্রেমের আর্তি, আত্মনিবেদন, ভূমিকম্পের ফলে নাট্যধর্মী সিচুয়েশন, অশ্বত্থ গাছ কাটবার সময় গাছটিকে শেষ বারের মত সিঁদুর মাখানো, হরিধ্বনি উচ্চারণ, দারোগাদের প্রজাদের উপর অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনা নাট্যগুণের পরিচায়ক।

পরিবেশের উপর নির্ভর করে লেখক যেভাবে গল্পের উপস্থাপন করেছেন তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে —

(১) উত্তম পুরুষে রচিত আত্মকথনমূলক রীতিতে অর্থাৎ 'আমির' জবানীতে প্রত্যেকটি চরিত্রের মনের কথা প্রকাশিত হয় যেমন -

" অম্বিকা দেবী বলিয়াছিলেন - মা, তুমি আমার মেয়ের মতো মেয়ে। আমার মেয়ে হয়নি, তুমি সে অভাব পূর্ণ করেছিলে। তারপরে বলিলেন - তোমাকে তো আমি ছেলেবেলা থেকে জানি।[৩৩]

চরিত্র এখানে 'আমির' জবানীতে মনের কথা প্রকাশ করেছে।

(২) ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতি ঃ অশ্বত্থের অভিশাপ উপন্যাসে লেখক মূল কাহিনীকে থামিয়ে রেখে অতীতের স্মৃতিচারণ করেছেন। তৃতীয় খন্ডের উপন্যাস লিখতে গিয়ে প্রথম খন্ডের ঘটনা তিনি পরিবেশন করেছেন - যেমন -

(১) " পলাশীর যুদ্ধ সেদিন ছিল সিরাজের দন্ড - আজ ভারতবর্ষ সেই দন্ডে দন্ডিত" [৩৪]

(২) " রোরুদ্যমান নববধূকে লইয়া দর্পনারায়ণের নৌবহর স্বদেশে যাত্রা করিল।"[৩৫]

— এখানে পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা ও বনমালাকে নিয়ে দর্পনারায়ণের যাত্রা অতীত ঘটনা জগার মা পরিবেশন করেছেন আবার ফিরে এসেছেন বর্তমানের ঘটনা প্রবাহে।

প্রমথনাথ পরিবেশের সৃষ্টি করেন বিবৃতি ও বর্ণনার মাধ্যমে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বিবৃতির ভাষায় গড়ে তোলেন পটপরিবেশ।

বাগানের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক ঃ

"প্রাচীরের ধার দিয়া সারবন্দী ডালিমের গাছ, মানুষের স্পর্শ হইতে বাঁচিয়া গিয়া তাহার স্বচ্ছ সবুজ পল্লব প্রাচুর্যে আর শরতের সোনাঢালা রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। একপাশে গোটা দুই নাতিদীর্ঘ শিউলির গাছ - সকালবেলার ঝরা ফুলগুলি শুষ্ক, শাখায় শাখায় অগুন্তি অস্ফুট কুঁড়ি। আর একদিকে পাতাবাহার গাছ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া চোখে পড়ে - উত্তর দিকে প্রকান্ড একটা দারুচিনির বৃক্ষ।" [৩৬]

- লেখক বিবৃতি ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন রঙ রেখায় পরিপূর্ণ এক প্রাকৃতিক পরিবেশ।

জীর্ণপ্রায় মহলের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক নিম্নোক্তভাবে ঃ

" জীর্ণপ্রায় চকমিলানো একটা মহল। মেঝেতে সিমেন্ট নাই, ঘোরা পিটাইয়া সমান

করিয়া দেওয়া হইয়াছিল - এখন অপব্যবহারে বন্ধুর। ছাঁদ নীচু, আস্তরখসা, দেয়ালে নোনা ধরিয়াছে, জানালা সংখ্যা নাই বলিলেও হয়, যাহা আছে অতি উচ্চে, অতিশয় ক্ষুদ্র। ইটগুলা এখনকার মতো নয়, পাতলা চৌকো, দরজার কাঠ ও হুড়কা এখনো খুব মজবুত।''[৩৭]

প্রমথনাথের কলমে চিত্রকল্পটি অনন্যতা দান করেছেঃ

'' সর্ষে ফুলের ঈষৎ মদির গন্ধ, তার সঙ্গে শিশির ভেজা চষা মাটির গন্ধ সন্ধ্যা বায়ুস্তরের ঘড়পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ — সবসুদ্ধ মিলিয়ে এক রূপকথার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য শালিক পাখীর ডাক, অদূরস্থিত আখের ক্ষেতের মধ্যে ব্যস্ত বাবুই পাখীর অকারণ যাতায়াতের পাখার শব্দ, বিলম্বিত গাভীটির করুণ আর্তস্বর, এমনি বহুতর শব্দজাল ভেদ করিয়া তাহারা চলিল। একবার আল ঘুরিতেই তাহাদের মুখ পশ্চিমে ফিরিল। সেখানে বনরেখার বাধাহীন অতিদূর পশ্চিমে না জানি কোন চোরাপাথরে ঠেকিয়া এইমাত্র সূর্যাস্তের ভরা তরী বানচাল হইয়া গিয়াছে। রাশি রাশি লাল নীল হলদে বস্তুপুঞ্জ নীল সমুদ্রে ভাসমান, আর সবার পিছনে দিগন্তের ঠিক কোণের কাছেই অগ্নিশিখা - পরিমন্ডিত সূর্যগোলকের তরণী একটু করিয়া অতলে তলাইয়া চলিয়াছে। এ কি নৈরাশ্যের সমারোহ, ধ্বংসের একি অকারণ আড়ম্বর। কয়েকটা জলচর পাখী উড়িতেছে - ওরা কি এই উপমা সিন্ধু শকুনের দল ?''[৩৮]

— আলোচ্য অংশে নবীননারায়ণ ও তার পত্নী মুক্তমালার সান্ধ্যভ্রমণের বর্ণনা রহস্যময় করে তুলেছে। 'অদৃশ্য শালিখের ডাক, গাভীর করুণ আর্তস্বর, সূর্যাস্তের ভরা তরী, অগ্নিশিখা পরিমন্ডিত সূর্যগোলকের তরুণী, সিন্দু শকুনের দল প্রভৃতি চিত্রকল্প এক স্বপ্নময় আবেশ সৃষ্টি করেছে। শব্দ চয়নের মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টিকরে এক লাবণ্যময় কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি পাঠকমনে রসসঞ্চার করেছেন লেখক।

প্রমথনাথ বৃটিশ রাজ্যের আদালতের বর্ণনাটি কতটা বাস্তবধর্মী ভাবে তুলে ধরছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

" বৃটিশ রাজ্যের আদালত এক বিচিত্র বস্তু। বৃটিশের আদালত একাধারে বিদ্যালয় ও ব্যবসায়, শ্মাশান ও সূতিকাগৃহ, পীঠস্থান ও সমাধিক্ষেত্র, তাড়িখানা ও বারাঙ্গনাগৃহ, মরুভূমি ও মেরুভূমি, দানসত্র ও পান্থনিবাস, মক্কা ও কাশী। "

—ইংরেজ আমলে বিচার বিভাগের নগ্নচিত্র লেখক এই বর্ণনার বাস্তবসচেতনভাবে তুলে ধরেছেন।

লেখক চিত্রাত্মক ও ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, বর্ণনায় আলঙ্কারিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। মহাকাব্যিক উপন্যাসের উপযোগী করে তুলবার জন্য উপমাপ্রয়োগে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন ঃ

চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক উদ্‌ঘাটনে উপমা প্রয়োগ ঃ

" মাতা যেমন ভাবে পুত্রের দিকে তাকায়, প্রণয়ী যেমনভাবে প্রণয়িনীর দিকে তাকায়, তেমনি ভাবে সতৃষ্ণ নেত্রে সে রহিয়া রহিয়া মাছ দুটির দিকে তাকাইতেছে, এই ঘোর অন্ধকারেও তাহার সজল দৃষ্টি মাছের গায়ে গিয়া যেন হাত বুলাইতেছে। " [৩৯]

- ভজহরি ও মানিকের কেনা ইলিশ মাছের প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টি বোঝাতে মাতার সঙ্গে পুত্রের, প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়িনীর দৃষ্টির তুলনাটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পরিবেশ চিত্রণে উপমার প্রয়োগ ঃ

" শিবাধ্বনি বিরহিত সেই নৈশ প্রহর জোয়ার-ভাঁটার আন্দোলনহীন সমুদ্রের মতো নিশ্চল।" (পৃঃ ৯১৭)

জোড়াদীঘিতে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, জমিদার, প্রজা প্রত্যেকেই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের

পর অসীম নির্জনতায় সময় গুনছে বোঝাতেপ্রমথনাথের উপরিউক্ত উপমাটি অনবদ্য।

চরিত্রের রূপচিত্রণে উপমার ব্যবহার ঃ

" মুক্তামালার চাঁপারঙের শাড়ির অঞ্চল চাঁপার গন্ধে বিমূঢ় বসন্তের মতো ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে।" [৪০]

- প্রকৃত সুন্দরী মুক্তামালার শাড়ির সঙ্গে চাঁপার গন্ধের তুলনাটি অনুপম।

উপন্যাসে মিথের ব্যবহার প্রমথনাথের উপন্যাসের আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য। যেমন -

" এক শ্রেণীর সৌন্দর্য আছে যাহাতে লোকে উন্মুক্ত হইয়া ওঠে, সে সৌন্দর্যের দেবতা - রতি ও মদন। আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্যে লোকের মনে পূজার ভাব জাগ্রত করে, তাহার দেবতা - লক্ষ্মী।" [৪১]

- মুক্তামালার সৌন্দর্য লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত - তার রূপলাবণ্য বর্ণনায় মিথের প্রয়োগটি অনন্যতা দান করেছে।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের গঠনের ক্ষেত্রে ছোট, বড় ও মাঝারি বিভিন্ন মাপের বাক্য উপস্থাপিত করেছেন।

বড়মাপের বাক্য ঃ

' ঘোমটা স্থানচ্যুত, ললাট নির্মল, ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ, কুঞ্চিত চূর্ণালোক নূতন আষাঢ়ের মেঘের মতো কমনীয় কর্ণদ্বয় ঢাকিয়া অংসবিলম্বী, কপোল পাণ্ডুরাভ, চোখ দুটিতে ঘনীভূত পরিমেয় করুণা, প্রাচীন হস্তিদন্তের বর্ণাভ - নিটোল সুটোল সৌন্দর্যের দ্রবীভূত চন্দনে চন্দ্রিকা - চিক্কণ বাম বাহুর করতল টেবিলের উপর ন্যস্ত।" [৪২]

বাক্যটিতে ছয়টি কমা, দুটি ছোট হাইফেনের পর বিরাম চিহ্ন বসেছে।

মাঝারি ধরণের বাক্য ঃ

" কুন্ডলিত অজগরের মতো সেই নীরবতা জনতা চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একসময়ে সরলরেখায় পরিণত হইয়া যেমন শিকারের উদ্দেশ্যে ঝম্প প্রদান করে - কুন্ডলিত সেই জনতাও তেমনি হঠাৎ সোজা হইয়া সর্দারকে অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যমুখে প্রধাবিত হইল।" [৪৩]

মাঝারি বাক্যটিতে চারটি অসমাপিকা ক্রিয়া তিনটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি হাইফেন বাক্যের মাঝখানে তারপর বিরামচিহ্ন। বাক্যটির একটি বৈশিষ্ট্য সাধুরীতির সঙ্গে (হইয়া) চলিতরীতির (করে) মিশ্রণ ঘটেছে।

ছোট বাক্য ঃ

" শ্রীচরণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীচরণ চলিল।"

বাক্যটিতে 'শ্রীচরণ' শ্লেষ অলঙ্কার বিশেষ। শ্রীচরণ এক অর্থে এক ব্যক্তি অন্য অর্থে পদ।

প্রমথনাথের উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক পান্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যের ব্যবহার। কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

(ক) " ভালোবাসার স্রোতও প্রকাশে গঙ্গা যমুনা ; ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রকাশের অভাবের পরিণাম তুষারস্তূপের ভূমিকম্প।" [৪৪]

(খ) " মানবজীবন স্রোত ও পুরাতন খাতকে বর্জন করে না, প্রত্যাবর্তন - প্রবণতা দেখায়।"[৪৫]

(গ) " নেশাতেই বল আর নেশাতেই একতা।" [৪৬]

(ঘ) " মানুষের ইতিহাস যে মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না সে তো এই কারণেই, তাই ইতিহাস ফেলিয়া সে সাহিত্যের আসরে আসে।" [৪৭]

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে বর্ণনা অংশে সাধুভাষা এবং সংলাপ অংশে চলিত

ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

লেখকের নতুন শব্দ গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এপিটোন বা নতুন শব্দ ঃ

অর্গল মোচন ক্ষমতা, ঢেঙ্গা, অদৃষ্টের ফাস, বাঁধাছাদা, জটাবাঘ প্রভৃতি শব্দ নতুন।

তৎসম শব্দ ঃ নীলাভ্র, মস্তক, স্থানুবৎ, কৃষ্ণসমারোহ, অস্তমিতচন্দ্রমা, শার্দূল - স্বস্তয়ন প্রভৃতি।

তদ্ভব শব্দ ঃ কেষ্ট, ইস্কুল, কোট প্রভৃতি।

দেশী শব্দ ঃ বল্লম, বেটাদের, বেচারী, বাঁশ, ট্যাক, লাঠিয়াল, ঝুঁটি, হুকা, কল্কে প্রভৃতি।

বিদেশী শব্দ ঃ মাষ্টার, টাইম টেবিল, টিয়ার গ্যাস, কন্‌ট্রিবিউশন, সুপার ম্যান, লার্নেড প্রফেশন, টেকনিক, এজলাস, মক্কেল, আলখাল্লা প্রভৃতি।

সমাসবদ্ধ পদ ঃ অষ্টাদশাধিক, রত্নপালঙ্ক, কিরণছটা, বিষবাষ্পপ্রশ্বাসী প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্বক শব্দ ঃ খচ্‌খচ্, ঠুক্‌ঠুক্, খক্‌খক্, হোহো, হাহা, হিহি, ঝাঁ ঝাঁ, ঠকাঠক, হন্‌হন্, সরসর, ঝরঝর, মরমর, ঝুপ্‌ঝুপ্, শন্‌শন্, খড়খড় প্রভৃতি।

না বাচক অব্যয় ঃ

" না তা হবে না, . . . না না , এ কিছুতেই হতে পারে না! আমার সব রসাতলে যাক, তবু এ হতে পারে না। " (পৃ ঃ ৮২৪)

— এখানে 'না' অব্যয় প্রয়োগে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখক চরিত্রের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন। শশাঙ্কের মুখে জীবনধর্মী ভাষার প্রয়োগ ঃ

" আহা হা, কি কথাই না শোনালে ঠাকুর! মাগীর বড় দেমাক্ হয়েছিল। " [৪৮]

আপাত দৃষ্টিতে সংলাপটিতে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী

এই ভাষা উপযুক্ত হয়েছে।

মোতির মার সংলাপটি ভদ্রেতর শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপ - " ও সব আমরা জানি রে বাদলি। দিনের বেলা যাকে ফিরিয়ে দিলি, রাতে তাকেই দরজা খুলে দিবি।" [৪৯]

বাদলিকে উদ্দেশ্য করে মোতির মার সংলাপটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গফুরের সংলাপ - " কিন্তু মরণেও এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয় ? ঐ দেখোনা গোপিনীদের জড়িয়ে ধরে ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।" [৫০]

ভদ্রচরিত্রের সংলাপ প্রয়োগেও লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত ঃ

" মুক্তা বলিল - কিন্তু অমন লোকের অমন না, অমন বউ কেমন করে হয় ?

নবীন বলিল — ওই তো স্বভাবের নিয়ম ইস্পাতের তলোয়ারের আশ্রয় কোমল মখমলের খাপ।" [৫১]

সংলাপ নৈপুণ্যে চরিত্রগুলো সজীব হতে পেরেছে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ীর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে প্রমথনাথের সাফল্য অবিসংবাদিত।

'কেরী সাহেবের মুন্সী'
উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

কথাসাহিত্যে উপস্থাপনার কৌশল বা আঙ্গিকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক কোন টেকনিকে উপন্যাস লিখেছেন উপন্যাসের কায়া কিভাবে নির্মিত হয়েছে আঙ্গিকের বিচার করতে গিয়ে সেটাই প্রধান বিচার্য। 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' যে টেকনিকে লেখা

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের আঙ্গিক একই ধারায় উপস্থাপিত হয় নি। উপন্যাসে উপন্যাসে লেখকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র হতে পারে। বনফুলের উপন্যাসের আঙ্গিক বৈচিত্র্য অভিনবত্বের দাবী রেখেছে। প্রমথনাথ বিশী 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ কতটা শিল্পগুণ সম্পন্ন আমরা সেটাই আলোচনা করছি।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' প্রমথনাথের সফল সৃষ্টি। একটা বৃহত্তর পটভূমিকায় ও বহু বিচিত্র উপাদান দিয়ে উপন্যাসের কায়া নির্মিত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ

"দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' গ্রন্থে প্রমথনাথের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা, তাহার উপন্যাস সৃষ্টির খন্ডাংশগুলি স্থির সংহতি ও রূপপরিণতি লাভ করিয়াছে।" [৫২]

পাঁচটি খন্ডে বিভক্ত উপন্যাসটির গঠন ছাঁদ বঙ্কিমী উপন্যাসে গঠন অনুসারী। মোট সাতাশিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন লেখক।

প্রথম খন্ড = ২০ টি পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় খন্ড = ১৮ টি পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় খন্ড = ২২ টি পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ খন্ড = ২২ টি পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম খন্ড = ৫ টি পরিচ্ছেদ।

প্রথম খন্ডে কুড়িটি পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্ন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্মেষ লগ্নের কলকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন ও কলকাতার ইতিহাস ও ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন। নবাগত ইংরেজদের ডিনার ডুয়েল, বিয়ার বোতলের লড়াই, নিকি বাঈজীর প্রতি আসক্তি প্রভৃতি ইংরেজী কালচার থেকে শুরু করে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য কেরীর

কলকাতায় আগমন, টমাসের সঙ্গে কেরীর পরিচয়, রামবসুর সংসার জীবন এই খন্ডের মূল আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় খন্ডে লেখক কাহিনী গ্রন্থনের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। জল্লাদ চন্ডীবক্সীর উদ্যোগে রেশমীকে সহমরণে আনা হলে সহমরণ থেকে রেশমীর পলায়ন কেরীর আশ্রয়ে জীবনরক্ষা, কেরী রামরামের খ্রীষ্টধর্মালোচনা , বারোয়ারীতলার বিচার ও কেরীর উদ্যোগে উডনীর নীলকুঠিতে বিদ্যালয় স্থাপন, গদ্যচর্চা, বসুপত্নীর সন্দেহ প্রবণতা, তিনু চক্রবর্ত্তীর দৌত্য, জাতকাছারির ভূমিকা, সহমরণের চিতা থেকে পলাতকা রেশমীর সঙ্গে রামরামের সম্পর্ক প্রভৃতি অজস্র ঘটনা এই খন্ডের মূল আলোচ্য।

তৃতীয় খন্ডে ইংরেজী প্রেমের ঘটনার অবতারণা করেছেন কেটি, জন, দুবো, রোজ এলমার সঙ্গে জনের প্রেম, এলমার মৃত্যু, জন রেশমীর প্রেমভাবনা, লিজার সন্দেহ প্রবণতা, কেরীর ছাপাখানা স্থাপন, জল্লাদ চন্ডী বক্সী কর্তৃক রেশমী হরণ, রেশমীর পলায়ন ঘটনা, রেশমীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার ব্যাপারে রামরামের পরামর্শ দান প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ খন্ডের সমকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। ইতিহাসের পালাবদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লেখক রেশমী, টুশকি, জন, রামরামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই খন্ডে কৌলীন্য প্রথার বিক্ষিপ্ত বিবরণ, সমাজ পতি মোতিরায়ের লাম্পট্য, বিলাসিতা, আড়ম্বর, রেশমী ও টুশকির মদনমোহনের চরণে আত্মনিবেদন, চন্ডীবক্সীর সক্রিয়তা, রেশমী ভ্রমে টুশকি মোতিরায়ের লাম্পট্যের সঙ্গী, অসহায় নারীদের আর্ত চীৎকার, মোতিরায় ও মাধবরায়ের জ্ঞাতি বিরোধ, জনের সঙ্গে যুদ্ধোদ্যম - যুদ্ধযাত্রা, মোতিরায়ের বাগান বাড়ি থেকে টুশকিকে সুকৌশলে সরানো, টুশকি, ন্যাড়া ও রেশমীর ভাই বোন হিসেবে পরিচয়, রেশমীর অগ্নিতে আত্মাহুতি ইত্যাদি ঘটনা এই খন্ডে স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম খন্ডে প্রমথনাথ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গোড়াপত্তন ও কলেজের পঠন পাঠন, মৃত্যুঞ্জয়ের সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র উদ্ধার, রামমোহনের সঙ্গে রামরামের কথোপকথন, 'রেশমী' 'রেশমী' বলতে বলতে রামরামের মৃত্যু পঞ্চম খন্ডের মূল ঘটনা।

উপন্যাসের মূল কাহিনীর প্রয়োজনেই ও আসন্ন ঘটনার ইঙ্গিতরূপে অতিলৌকিক উপাদানকে উপকরণরূপে বেছে নিয়েছেন লেখক। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে কাহিনীর গতি পরিবর্তনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। মোট পাঁচটি স্বপ্নের অবতারণা লেখকের শিল্পকুশলতার পরিচয়বাহী। প্রথম স্বপ্নে নীলুদত্ত স্বপ্নে দেখেছে একটি হারিয়ে যাওয়া মেষ শিশুকে খুঁজে গৃহে আশ্রয় দেবার। পাদ্রী কেরী সাহেবই যে হারিয়ে যাওয়া মেষশিশু তা উপলব্ধি করে প্রচারকেন্দ্ররূপে তার গৃহে দান করে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছে রেশমী নৌকাডুবির সময় দুটি শিশুমুখ পদ্মপাতার উপর বসে আছে। এই শিশু দুটিই যে তার ভাই ন্যাড়া ও বোন টুশকি তা বোঝা যায় কাহিনীর মধ্যভাগে।

তৃতীয় স্বপ্নটি দেখেছে রেশমী তিনটি তারার মধ্যে একটি জন স্মিথের তরা - সে বলে যায় রেশমী খুব সুন্দরী। রেশমী তার সৌন্দর্যবোধ উপলব্ধি করেছে।

চতুর্থ স্বপ্নটিও দেখেছে রেশমী, তাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে মোতিরায়, চন্ডীবক্সী একদিকে অন্যদিকে চিতার আগুন।

পঞ্চম স্বপ্নে রেশমী ও জন শয্যার ঘরে আগুন। এই স্বপ্ন দর্শন জনকে চিঠি লিখতে উদ্যোগী করেছে। কাহিনীর গতিকে পরিবর্তন করতে এই স্বপ্নদর্শন গুরুত্বপূর্ণ।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে মোট ছয়টি চিঠি উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণে সংযোজিত হয়েছে। গঠন বিন্যাসের উপকরণরূপে প্রত্যেকটি চিঠি তাৎপর্যপূর্ণ। চিঠিগুলি কাহিনীর

ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে মূর্ত করে তুলেছে ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে প্রকাশ করেছে।

প্রথম চিঠিটি দুবো কেটিকে লিখেছে, মর্মান্তিক চিঠিটিই কেটির মৃত্যুর কারণ হয়েছে। দ্বিতীয় চিঠিটি রেশমী লিখেছে একটি টুকরো কাগজে। রেশমীর মনস্তাত্ত্বিকদিক উদ্‌ঘাটনে এই পত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। তৃতীয় চিঠিটি রেশমীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে লিজা। রেশমী যাতে জনের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে মত পরিবর্তন করে এজন্যই এই চিঠির অবতারণা করা হয়েছে। চতুর্থ চিঠিটি রেশমী জনকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে। উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এইটি। মদনমোহনই তার স্বামী এটা জানতে পেয়ে জন রেশমীকে যে চিঠি লিখেছিল তার রূঢ় ভাষা রেশমীকে ব্যথিত করে তুলেছে। ষষ্ঠ চিঠিটি বন্দিনী রেশমী টুশকির হাতে পাঠিয়েছিল। জনের যুদ্ধযাত্রার পেছনে এই চিঠির গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র আখ্যান গঠন শিথিলতার উল্লেখ করেছেন। অতর্কিত ট্র্যাজিক উপসংহার আর্টের সঙ্গতি নষ্ট করেছে। এছাড়া জনের যুদ্ধ যাত্রা সেনা সমাবেশ হাস্যোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছে। এই অভিযান যেন কল্পনা বিলাসী পর্যায় ভুক্ত।

আঙ্গিক প্রকরণে ছড়া, চূর্ণকবিতা, গান ও লৌকিক বিশ্বাস স্থান পেয়েছে। ন্যাড়ার আত্মপরিচয়, রামবসুর যিশু সম্বন্ধে গীত, নিকি বাঈজীর গান, রহিমা ও প্রমদার সাহেবী কণ্ঠে গান, সহমরণে যাবার সময় চণ্ডীখুড়োর গান, কেটি ও লিজার উদ্দেশ্যে এক যুবকের গান, আব্রাহামের কণ্ঠের গান, রক্ষিতা ফুলকি গান, কেরীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ছাপাখানা আবিষ্কারের জন্য এই উপলক্ষে গান, মোতিরায়ের ছড়া তৈরী এছাড়া জনের যুদ্ধযাত্রাকালে জন, মেরিডিথ, প্রেষ্টন, অগলারের কণ্ঠে সম্মিলিত সঙ্গীত, পলাশীর যুদ্ধের ছড়াগান, গঙ্গারামের বাংলা ইংরেজী মিশ্র সঙ্গীত, রামরামের সঙ্গীত, মোতিরায়ের নাচঘরে বাবুরামের

গান উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গঠন বিন্যাসের অভিনবত্বের জন্য এই গানগুলোর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সন্দেহ নেই।

আঙ্গিক ও ভাবগত দিক থেকে কেরী সাহেবের মুন্সী উপন্যাসের নামকরণটিও শিল্পসম্মত হয়েছে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের পঞ্চম খন্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে নামকরণটি উপজীব্য হয়ে উঠেছে -

" মদনাবাটিতে বাংলা গদ্যসৃষ্টিতে কেরীর ব্যক্তিগত প্রয়াস, শ্রীরামপুরের মিশনে পাদ্রীদের সঙ্গে মিলিত প্রয়াস আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এসে সেই প্রয়াস রাজকীয় সমর্থন ও সাহায্য । তিন জায়গাতেই রামরামবসু তার মুন্সী, তার প্রধান সহায়।" [৫৩]

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের কাহিনী প্রধানত তিনটি। প্রথমটি রামরামবসু ও উইলিয়াম কেরীর কাহিনী দ্বিতীয়টি রেশমী ও চন্ডীবক্সীর কাহিনী তৃতীয় কাহিনী হল জন, এলমা ও লিজার কাহিনী। উপকাহিনী দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে পরিপুষ্ট করেছে ও পরিণতিতে সহায়তা করেছে। কিছু কিছু খন্ড চিত্র বিক্ষিপ্ত হলেও আদি মধ্য ও অন্ত পর্যন্ত কার্যকারণ ধারায় কাহিনী অগ্রসর হয়ে পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে চাঁদপাল ঘাটে দিনেমার জাহাজ প্রিন্সেস মারিয়ার আগমন প্রতীক্ষা দিয়ে যখন গঙ্গার ওপারে বাবলা বনের দিগন্তে হেমন্তের সূর্য ডোবার সমকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করে।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন নায়ক রামরামবসুর মৃত্যুঘটনা দিয়ে। লেখক তাঁর মৃত্যুর পর দিবসের প্রাকৃতিক পটভূমিতে কাব্যগুণ উদ্ভাসিত - "প্রভাত হল, পরম শোকের পরদিবসেও সূর্য তেমনি উজ্জ্বল, বাতাস তেমনি মধুর, আকাশ তেমনি নির্মল। আশ্চর্য এই

জীবন আশ্চর্য এই পৃথিবী। ১৮১৩ সালের ৭ই আগষ্ট।''

ঔপন্যাসিক সময়ের প্রযুক্তির উপর বিশেষ সচেতন। সময়কে বিচিত্র জটিল ও গূঢ় গম্ভীর প্রভৃতি প্রয়োগ রীতির মধ্যস্থতায় পরিবর্তমান সময়ের ছবি ফুটিয়ে তোলেন। প্রমথনাথ সময়বিন্যাসের মধ্যে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের শুরুতেও সময়ের উল্লেখ আবার সমাপ্তি টেনেছেন সময়ের বিন্যাস করে। যে সময়ের নিরীক্ষণবিন্দুতে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে তা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ। লেখক বর্ণনা করেছেন -

'' অষ্টাদশ শতকের শ্বেতাঙ্গ সমাজ ছিল ধর্মবিষয়ে উদাসীন, পাদ্রীরা প্রশ্রয় পায় নি রাজপুরুষদের কাছে। টমাস নিজেই স্বীকার করেছে কুড়ি বছরের প্রচেষ্টাতেও একটা নেটিভ দীক্ষিত করতে পারে নি!'' [৫৪]

— 'এখানে অষ্টাদশ শতাব্দী', 'কুড়ি বছরের প্রচেষ্টা' ইত্যাদি সময় বিন্যাস কাহিনী নির্মাণে সার্থক।

'' সেদিন খুব ভোরবেলা, রামবসু জনের অফিসে এসে উপস্থিত হল'' — ''একিমুন্সী যে! একযুগ পরে কোথা থেকে এলে!'' এক যুগ না হলেও মাস খানেক নিশ্চয়।''

— এখানে ভোরবেলা, একযুগ, মাসখানেক ইত্যাদি সময়বিন্যাস একধরণের শিল্প।

''ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে এক কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। সেটা ইংরেজী ১৮০০ সালের কথা।' ১৮৫৪ সালে কলেজ বাতিল হয়ে যায়।'' ''১৮৮১ সালে কেরী বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করে কলেজে।'' — এখানে সালের বিন্যাসে অতীতের কালপট চিহ্নিত। ঔপন্যাসিক সুদীর্ঘ সময়ের বিন্যাস করে ব্যক্তিসত্তার সমগ্রতা দান করেছেন।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে স্থানগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে সন্দেহ নেই। জোড়ামউ

গ্রাম, কলকাতা, শ্রীরামপুর, মালদহের মদনাবাটী, কাশীপুর, মদনমোহনতলা প্রভৃতি স্থানের কাহিনীধারা আবর্তিত হয়েছে। স্থানগত ঐক্য আঙ্গিক প্রকরণের বৈশিষ্ট্য।

প্রমথনাথ 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে কাহিনীবৃত্ত রচনায় এবং কাহিনী উপস্থাপন রীতিতে নাট্যগুণের অভাব নেই। লেখক আলোচ্য উপন্যাসে নাট্যোৎকণ্ঠা, নাটকীয় চমক, নাট্যদ্বন্দ্ব, নাটকীয় আকস্মিকতা প্রভৃতি নাট্যগুণের সমাবেশ ঘটিয়ে শৈল্পিক তাৎপর্যে ভাস্বর করে তুলেছেন।

স্নেহ ঈর্ষা, স্বার্থপরতাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাত বা বিরোধ চিত্র এঁকেছেন এছাড়া নায়ক নায়িকার দুর্নিবার প্রণয়াকুতি সহমরণ থেকে পলাতক রেশমীর কেরীর আশ্রয়লাভ, বারোয়ারী তলায় চন্ডীবক্সী ও তিনু চক্রবর্ত্তীর লড়াই, চন্ডীবক্সীর শাস্তি, সেমিজ নিয়ে রামবসুর সঙ্গে অন্নদার বিরোধ প্রভৃতিনাটকীয় চমক সৃষ্টিতে প্রমথনাথের শিল্পকুশলতার পরিচয় ঘটেছে। নিম্নোক্ত সংলাপটিতে নাট্যগুণ সুষ্পষ্ট ঃ

" রেশমী টুশকিদি বলে কাঁদতে থাকলে টুশকি জানায় " ওরে টুশকি নয়, বল টুনি দি . . . এবারে চীৎকার করে টুশকি বলে ওঠে, ওরে রেশমী রেশমী এতকাল কেন সৌরভী নাম নিয়ে ভাঁড়িয়ে ছিলি, কেন বলিস নি তুই আমার আপন বোন, তুই রেশমী।" [৫৫]

রেশমীর মনে জাগে অভাবনীয় চমক। দুজনের পরিচয় সূত্র উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ সার্থকভাবে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

নাট্যদ্বন্দ্বের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে নিম্নোক্ত অংশে। নিশ্চল, নির্বিকার, পাষাণবৎ রেশমী মোতিরায়ের নাচঘরে আগুন লাগিয়েছে আত্মাহুতি দেবার জন্য এই মুহূর্তে জনকে দেখে -

" রেশমী বলল, জন, তুমি এসেছ! আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছা করছে, আবার আমার তোমার বুকে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তা বুঝি হবার নয়।"

'' জন আর্তস্বরে বলে উঠল, এখনও সময় আছে, নেমে এস নেমে এস।''

- রেশমী ও জনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বটিকে লেখক সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রেশমীর মৃত্যুর পর যন্ত্রণা দগ্ধ হযেছে রামরাম। গঙ্গার ঘাটে একটি বাল বিধবা মেয়েকে বলপূর্বক চিতায় তুলে দিলে সহমরণ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রামরাম ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারে নি নিজে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। অংশটিতে নাটকীয় আকস্মিকতা শৈল্পিক ভাস্বর হয়েছে সন্দেহ নেই।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণে লেখকের গভীর মন্তব্য তীক্ষ্ম ও সরসভঙ্গীতে নিগূঢ় ভাব প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। এপিগ্রাম ও শ্লেষ জাতীয় বাক্যগুলিতে লেখকের মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। যেমন ঃ

১) ''যৌবন বহির্মুখী, বার্ধক্য অন্তর্মুখী।'' [৫৬]

২) '' মানুষ গাছ, দুঃখ পরগাছা, গাছের ফুলের চেয়ে পরগাছার ফুলের সৌন্দর্য বেশী।'' [৫৭]

৩) '' প্রেমের জন্যই ধর্ম'' [৫৮]

৪) '' প্রকৃত সৌন্দর্য দুঃখে সুন্দরতর হয়। ঝড়ের আকাশে চন্দ্রকলা মধুরতর।''

৫) '' প্রত্যেক নারী সম্ভবিতা মাতা।''

৬) '' মূল বনস্পতির উচ্চতা উপরেই পরগাছার উচ্চতা নির্ভর করে।''

৭) '' সন্দেহ যতই দামী হক, দিন রাত্রির পাহারা বসিয়ে রাখবার মত দামী নিশ্চয় নয়।''

৮) '' যাদের বয়স কুড়ির কোঠায় গীর্জা আর গোরস্থান দেখবার আগ্রহ তাদের হবার কথা নয়।''

৯) '' মানলে কেউটে না মানলে ঢোঁড়া - এই হচ্ছে গিয়ে তন্ত্রমন্ত্র।''

১০) " মনের মানুষের চেয়ে কাছে আর কে? "

১১) " সাংসারিক শান্তির অভাবেই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রেরণা। "

১২) " যে দেশ ধর্মের কল নাড়াবার ভার বাতাসের উপর অর্পণ করে নিশ্চিত থাকে, সে দেশের দুঃখের অন্ত থাকে না।"

কেরী সাহেবের মুন্সী উপন্যাসের আরও কিছু সংক্ষিপ্ত বা বিদ্রূপাত্মক উক্তি প্রদত্ত হল ঃ

১) " ভগবান যখন নিতান্ত কুৎসিত কালো মেয়ে গড়েন তখন সেই সঙ্গে অনুরূপ রুচি দিয়ে একটি পুরুষ গড়তেও ভোলেন না।" [৫৯]

২) " গুজব শরতের মেঘ দেখতে দেখতে তার আকৃতি প্রকৃতি যায় বদলে। " [৬০]

৩) " কুরুক্ষেত্র মহাহব থেকে পাড়ার বেলগাছটা নিয়ে হাঙ্গামা কোনটাই পূর্ব পরিকল্পনা প্রসূত নয়। " [৬১]

৪) " মানুষের আর সব সম্বল যখন ফুরিয়ে যায়, তখন হাতে থাকে চোখের জল। ওর আর অন্ত নেই, কোন দুর্জ্ঞেয় চির হিমানী - শিখরে ওর উৎস।"[৬২]

প্রমথনাথ উপন্যাসে ছোট, মাঝারি ও বড়বাক্য সুযমভাবে ব্যবহার করেছেন। বাক্যগঠনে যতি চিহ্নের প্রয়োগ নৈপুণ্য প্রশংসাতীত।

বড় বাক্য ঃ

" সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুখতন্দ্রালীন জন যখন Coligot (Kalighat) এর Coli (Kali)র উদ্দেশ্যে শতশত Salutation জানাচ্ছিল, মনে মনে বলছিল যে, হিন্দু শাস্ত্রের Yogic rites সব অব্যর্থ, নতুবা এমন hand to hand fruit কি রকম ফলল - আগের দিন রোগ ছিল উদাসীন, আজ সে - প্রায় তার কণ্ঠলগ্ন, ঠিক সেই সময়েই রেশমী বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে কালীঘাটের মা কালীর উদ্দেশ্যে শত শত প্রণাম করে বলছিল - মা, তোমার

লীলার অন্ত নেই, এই কবচের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াও তোমার এক লীলা মা।'[৬৩]

বাক্যটির পূর্ণচ্ছেদ এসেছে ৬ লাইনে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এখানে সাতটি কমা; তিনটি হাইফেন। লেখক ইচ্ছে করলে ছোট ছোট বাক্যে বিন্যস্ত করতে পারতেন কিন্তু সে উদ্দেশ্য তার ছিল না। এক তীব্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় বাক্যটিতে সাতটি অসমাপিকা ক্রিয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে - অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রাচুর্য বক্তব্যের ভিত্তিকে আরও দৃঢ়মূল করেছে সন্দেহ নেই। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় লেখক কিছু ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রভাষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মাঝারি বাক্য ঃ

" নৌকার গতি এমন নিঃশব্দ আর মসৃণ যে আরোহী জানতেও পায় না নৌকাখানা ছাড়ল কিনা কিংবা কতদূর এল - হঠাৎ একসময় সচেতন হয়ে দেখতে পায় যে তীরভূমি কতদূর গিয়ে পড়েছে - আবার সেই সঙ্গে দেখে যে অপর তীর কখন অভাবিতভাবে কত কাছে এসে পড়েছে।" [৬৪]

মাঝারি আকৃতির বাক্যটির বিরামচিহ্ন বসেছে দুটি হাইফেনের পর।

ছোট বাক্য ঃ

" রামরাম বসুর আমূল ভেঙে পড়া জীবন করুণা জাগায় দর্শকের মনে।"[৬৫]

প্রমথনাথ 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে গুরুগম্ভীর বক্তব্য প্রকাশের জন্য চলিত ভাষার পাশাপাশি তৎসম শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। যেমন -

" সমগ্র জনতার সমবেত হায় হায় ধ্বনির মধ্যে অগ্নিবলয় গ্রাস করল রেশমীকে। এখন বহ্নিনয়ন, বিবাহের দিব্য দুকূলে তার দিব্য অঙ্গ মন্ডিতঅগ্নি শিখার বলয় তার বাহুতে,

অগ্নিশিখার কুন্ডল কর্ণে, অগ্নিশিখার সিঁথি সীমন্তে, অগ্নিশিখার স্বর্ণহার তার কণ্ঠে, অবশেষে স্বয়ং অগ্নিদেব স্বর্ণোজ্জ্বল কিরীটি পরিয়ে দিলেন তার শিরে।'' [৬৬]

- এখানে অগ্নিবলয়, বহ্নিনয়ন, দিব্যঅঙ্গ, অগ্নিশিখা, কুন্ডলকর্ণে, স্বর্ণহার, অগ্নিদেব, স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভৃতি তৎসম শব্দ।

বিদেশী শব্দ ঃ খানসামা, সর্দার, বেয়ারা, বাবুর্চি, আবদার, দারোয়ান, সহিস, ভিস্তি, চাপরাসী প্রভৃতি।

নতুন শব্দ বা এপিটোন ঃ অন্ধিসন্ধি, অদূরশায়ী, দোহাত্তা, নাওয়াখাওয়া প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ ঘড়ঘড়, হো হো, মরমর, সরসর, ঝন্‌ঝন্, খাঁ খাঁ, টুংটাং, ছুকছুক, গুণগুণ প্রভৃতি।

হিন্দীবাক্য ঃ (ক) '' বান্দা হাজির হ্যায়, হুজুর, কুচ ফরমাইয়ে।''

(খ) '' লেকিন দিলতো বহুত খারাপ হ্যায়।''

'' কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের বর্ণনামূলক গদ্যরীতির অভাব নেই। লেখকএকান্ত বর্ণনার ধীরতার মধ্যে বক্রতা, নাটকীয়ত্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমনঃ

(ক) কলকাতার রাস্তার বর্ণনা ঃ

'' রাস্তার দুপাশে বরাবর কাঁচা নালা, মাঝে মাঝে যেখানে বেশি আবর্জনা জমেছিল সেখানে এখনও জল শুকোয়নি। জলে অনেক দিনের অনেক রকম আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ উঠেছে; যেখানে আবর্জনার স্তূপ বেশি সেখানে কুকুরে শালিখে কাকে টানা টানি শুরু করেছে। এমন সময়ে উৎকট পচা গন্ধে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু অধিক সন্ধান করতে হল না - একটা মৃত অর্ধভুক্ত নরদেহ তাড়াতাড়ি ভাবে রাস্তার উপরে শায়িত, গোটা চার পাঁচ বীভৎস শকুনি মাংস ছিঁড়ছে। গাড়ির চাকার শব্দে তারা উড়ে নালার ওপারে

গিয়ে বসল। এতক্ষণ গোটা দুই কুকুর শকুনের পাখাশাপটের ভয়ে কাছে ঘেঁষতে পারছিল না, সুযোগ বুঝে এবারে তারা মৃতদেহের উপরে গিয়ে পড়ল। ওদিকে স্বত্ব যায় - দেখে শকুনিগুলো পাখা ঝাপটে কর্কশ ধ্বনি শুরু করে দিল ।''[৬৭]

এখানে কাঁচানালা, আবর্জনার স্তূপ, কুকুর শালিখে টানাটানি, মৃতে অর্ধভুক্ত নরদেহ, বীভৎস শকুনি মাংস ছিঁড়ছে, গাড়ির চাকার শব্দ, শকুনিগুলোর পাখা ঝাপটের কর্কশধ্বনি - সব মিলিয়ে একটা বীভৎস দৃশ্যের আয়োজন ও শব্দময় স্রোত মিলিয়ে বর্ণনামূলক গদ্যটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এটি চিত্রানুগ বর্ণনার দৃষ্টান্ত।

(খ) মোতিরায়ের নাচঘরের বর্ণনা ঃ

'' বাগান বাড়িতে একতলার প্রকান্ড নাচঘরের পর্দাটা ঝাড়ের আলোয় শুভ্র জাজিমে আসীন, শয়ান, অর্ধশয়ান ''বাবু'' দের সোনার চেন হীরার আঙটি, কোঁচানো চাদর, গিলে করা জামা, কুঞ্চিত কেশদাম, মসৃন টাক, নিমীলউন্মীল রক্তাভ নেত্র অপূর্ব শোভা বিস্তার করছে। সেই সঙ্গে ফুলের মালার, আতর গোলাপের আর সুরার গন্ধ টানাপাখার বাতাসের তালে তালে হিল্লোলিত। অদূরে উপবিষ্টা নিকি বাঈজী তানপুরা নিয়ে গান করছে '' বাজে পাঁয়োরিয়া ঝনন নন। ''[৬৮]

— এখানে ঝাড়ের আলো, শুভ্র জাজিম, সোনার চেন, হীরার আংটি, কোঁচানো চাদর, ফুলের মালা, আতর গোলাপ,সুরার গন্ধ, টানাপাখার বাতাস, বাঈজীর তানপুরা, সঙ্গীতের সুর তৎকালীন বাবুদের স্থূল রুচিবোধের এক জীবন্ত বর্ণনামূলক চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় বর্ণনাটি নাট্যানুগ বর্ণনার শ্রেণীভূক্ত।

(গ) রামমোহনের দেহের সৌষ্ঠব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ঃ

'' উদার বক্ষ, প্রশান্ত পৃষ্ঠ, যুগন্ধর স্কন্ধ, মুখমন্ডল অনুসারে চোখদুটি ছোট, কিন্তু

উজ্জ্বল, . . . সরল নাসিকাটির মাঝখানে একটুখানি অতর্কিত উচ্চতা, উপরের পাটির সম্মুখের একটা দাঁত ঈষৎ ভগ্ন, চিবুকের নীচে চওড়া কাটা দাগ।'' [৬৯]

- চোখ, নাসিকা, দাঁত, চিবুক প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের ফলে নিখুঁত বর্ণনাত্মক গদ্যরীতি প্রশংসনীয়।

(ঘ) লেখক রূপচাঁদ পক্ষীমশাই এর রূপের বর্ণনাটি কতটা জীবন্ত তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

'' দরজা ঘুলে বাইরে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। দীর্ঘ কঙ্কাল, হাঁটু পর্যন্ত মলিন ধুতি, পায়ে খড়ম, খালি গা, জীর্ণ উপবীত, অত্যুজ্জ্বল কোঠরাগত চক্ষু, মুখমন্ডলের বাকি অংশ - গাল কপাল, চিবুক প্রভৃতি - অজস্র বলিচিহ্নিত, চুল সাদা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোফও সাদা, বয়স পয়ঁত্রিশও হতে পারে আবার পঁচাত্তর হতেও বাধা নেই।''[৭০]

(ঙ) প্রমথীয় বর্ণনায় এসেছে চিত্ররূপময়তা - এসেছে দৃশ্য ধ্বনি ও রং। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

'' গঙ্গাতীরে জলের ধারে সজ্জিত চিতায় নববস্ত্র পরিহিত যুবকের দেহ শায়িত। রোরুদ্যমান আত্মীয়স্বজনের ব্যূহ মধ্যে রক্তাম্বরা মাল্যভূষিতা কিশোরী বধূ দন্ডায়মান। ইতস্তত দর্শকের ভিড়। রেশমী আর টুশকি গিয়ে একান্তে দাঁড়াল।

কিশোর বধূ গুরুজনদের প্রণাম করে, খই আর কড়িবৃষ্টির মধ্যে অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হয়ে চিতায় উঠল। নবোদ্যমে বেজে উঠল শঙ্খ, কাঁসর, ঢাক। চিতায় অগ্নি স্পৃষ্ট হল। একবার আগুনের হল্কার মধ্যে দেখা গেল তার ঈষৎ আনত মুখ।''

এই দৃশ্যের একপ্রান্তে চেয়ে ছিল রেশমী ও টুশকি। অন্যপ্রান্তে ইতস্তত দর্শকের ভিড়, রোরুদ্যমান আত্মীয়স্বজন। এর মধ্যে আছে দর্শকের ও পাঠকের অস্তিত্ব। ফলে দৃশ্যটি জটিল অথচ পরিপাটি রূপে অঙ্কিত হয়ে উঠল ঃ

(ক) দর্শক + রেশমী ও টুশকি।

(খ) রেশমী টুশকি + দৃশ্যটি।

(গ) আত্মীয় স্বজন + দর্শক + রেশমি, টুশকি + দৃশ্যটি

(ঘ) রেশমী টুশকী + দৃশ্যটি + আত্মীয় স্বজন + দর্শক।

নূতন আয়তনযুক্ত এই গদ্যরীতি সামাজিক সংলগ্নতার একটি ভঙ্গী।

বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরীতি ঃ

" রেশমী যখন ছাড়া পায়, ঝড়ে দোল খাওয়া বসন্তের পুষ্পবনের মত তার চেহারা। গাছতলায় বিন্যস্ত রঙ্গন, পলাশ, রক্তকবরী; বিতান পরিত্যক্ত মাধবীলতা ভূলুণ্ঠিত ; পল্লবনিলীন পুষ্পস্তবক দস্যু হাওয়ার করক্ষেপে মর্দিত, পাণ্ডুকপোল চমুকদল ছিন্নভিন্ন, বনানীর পত্রলেখা অবলুপ্ত, বসনাঞ্চল বিস্রত আর তার বক্ষের শিখরিণী ছন্দ তখন শার্দূলবিক্রীড়িতের উৎকৃষ্ট তালে সংষ্পন্দিত।"[৭১]

কাব্যধর্মী ভাষায় রেশমীর আত্মসমর্পণকে অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। দীর্ঘবাক্যের বর্ণাঢ্যাতার স্থান লাভ করে আছে বিশেষ্য ও বিশেষণের ও সমাসবদ্ধ পদের অর্থগৌরব। লেখক এখানে প্রাকৃতিক পটভূমিকায় অনবদ্য ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। রেশমীর মানসিক অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বেশ বৈষম্যযুক্ত। কাব্যধর্মী এই বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরীতিটি সার্থক।

আবেগধর্মী গদ্যরীতি ঃ

" জনের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই পাষাণ গলল, সে বলে উঠল, জন, জন, তুমি এসেছ।

রেশমী, আমি ভুল বুঝেছিলাম, ভুল করেছিলাম নেমে এস।

রেশমী বলল, জন, তুমি এসেছ! আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে, আবার তোমার

বুকে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু তা বুঝি হবার নয়।

জন আর্তস্বরে বলে উঠল, এখনও সময় আছে, নেমে এস, নেমে এস।

না জন, আর সময় নেই, নিজের হাতে লাগিয়েছি আগুন, এ আগুন এখন আমার সাধ্যের অতীত।'' [৭২]

— ছোট ছোট বাক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহের আবর্তে আবেগ প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে জনের প্রণয়াকুর্তি অন্যদিকে আত্মাহুতি দানের সঙ্কল্প সহজ সরল ভাষায় লেখক পাঠক সাধারণের মনে আবেগ ও বিস্ময় সঞ্চার করেছেন।

ঔপন্যাসিক পাত্রপাত্রীদের মুখে ভদ্রেতর ও ভদ্রভাষা ব্যবহার করেছেন। সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক নিজে আত্মগোপন করে চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছেন ঃ

চন্ডীবক্সীর মুখে মালদার আঞ্চলিক ভাষা দিয়েছেন -

(ক) '' কালামুখ আর পোড়াস নে, মেলেচ্ছর নৌকা থেকে নেমে আয় বলছি!''

(খ) '' ভাবিস নে ছুঁড়ি তুই রক্ষা পেয়ে গেলি!''

- চন্ডীবক্সীর চরিত্রের সঙ্গে এরূপ ভাষা উপযুক্তভাবে সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছে।

প্রমথনাথ উপন্যাসে দুটো স্থানে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অশ্লীল ভাষা শুনলে লজ্জা ও ঘৃণা হয় লেখক সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন সন্দেহ নেই, তবুও চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অশ্লীল ভাষা লেখক সচেতন ভাবেই ব্যবহার করেছেন যা অশ্লীল পদবাচ্য হয়ে ওঠে নি।

(ক) ''তবে রে শালা, লাফিয়ে ওঠে চন্ডীবক্সী।''[৭৩]

(খ) '' আর শালা লোককো মৎ ভাগনে দেও'' [৭৪]

(গ) তা কেমন করে হবে মা ? বেশ্যামাগীরাও তো আসে।''

— এখানে 'শালা' 'মাগী' শব্দদ্বয় অশ্লীল। শহুরে ও তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে যে শব্দ নিতান্ত অশালীন বলে হয়তো উচ্চারণের অযোগ্য, 'শালা' ও 'মাগী' শব্দদ্বয় প্রমথনাথ যে পরিবেশে যে চরিত্রের মুখে প্রয়োগ করেছেন তা ঔপন্যাসিকের বাস্তবনিষ্ঠার এক বিশেষ নিদর্শন।

উপমা সাহিত্যে প্রসাদগুণ এনে দেয়। প্রমথনাথের উপমার সূক্ষ্ম কবিত্বের স্পর্শ উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

(১) " মিস এলমাকে মনে হয়েছিল পেটিকোট পরা শরতের উষা। আর এখন রেশমীকে মনে হল শাড়ি পরা বসন্তের সন্ধ্যা।" 'শরতের উষা' ও 'বসন্তের সন্ধ্যা' উপমা দুটি চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।"

(২) " দ্রৌপদীও তো বাধা দেয়নি পান্ডবদের নীলপদ্মের সন্ধানে যেতে।" [৭৫]

উপমাটি মিথের ব্যবহার হয়েছে। জনের লাল ফুল আনতে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিপদ হতে পারে ভেবে রেশমীর এই উপলব্ধি চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সার্থক উপমা।

(৩) " ভগ্ন মহীরুহের মত একেবারে ভেঙে গিয়ে পড়ল জন, চিন্তা করবার শক্তি তার লোপ পেল।" [৭৬]

রেশমীর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে সংস্কার অন্তরায় এ খবর জানবার পর জনের মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝাতে উপমাটি হৃদয়গ্রাহী।

(৪) " মনের কোনে জেগে থাকে অন্ধকার আকাশের কোনে শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলার মত তার মধুর হাসিটুকু।" [৭৭]

- দেবতার চরণে নিবেদিত প্রাণ রেশমীর উৎসারিত ভক্তির আবহ প্রকাশের ক্ষেত্রে

লেখকের এই উপমাটি সার্থক।

(৫) অনুপ্রাস অলঙ্কার ঃ

" রেশমীকে সে দেখেছে আজ দু বছর উপর, তাকে চপল চঞ্চল বালিকা ছাড়া কিছু মনে হয় নি।"

— চপল চঞ্চল অনুপ্রাস অলঙ্কার।

মিথের ব্যবহার প্রমথনাথের উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। কাহিনী গ্রন্থনে প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই পুরাণ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন শিল্পী প্রমথনাথ। সুভদ্রাহরণের কাহিনী, বিশল্যকরণী না পেয়ে গন্ধমাদন বহন, রেশমীকে রূপের সঙ্গে তুলনা, নলের রাজহংসদূতের প্রসঙ্গ, লক্ষণ না হয় সীতা, সগর রাজার সন্তানরা কপিলের শাপে ভস্ম হয়েছিল উদ্ধার করলেন তাদের জাহ্নবী এরূপ অজস্র মিথকাহিনী 'কেরী সাহেবরে মুন্সী' উপন্যাসকে সাহিত্যিক তাৎপর্য দান করেছে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসটি উত্তমপুরুষের আত্মকথন রীতিতে পরিবেশন করেছেন লেখক। যেমন -

" আমি সব সমর্পণ করলাম আর তিনি দয়া করবেন না এমন কি হতে পারে?" [৭৮]

" ফ্রেন্ড, আমার বোনটিকে তোমায় দিয়ে গেলুম, এর চেয়ে মূল্যবান আমার আর কিছু নেই, ওর অযত্ন কোরোনা, এমন নারীরত্ন বিরল।" [৭৯]

আমি, আমার জবানীতে মনস্তাত্ত্বিক ছবিটি পাঠক মনে বিশ্বাস যোগ্যতা সঞ্চার করতে পেরেছে।

প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবে মুন্সী'র প্রধান চরিত্র রামরাম, কেরী সাহেব, চন্ডীবক্সী, রেশমী ও জন। অপ্রধান চরিত্র তিনু চক্রবর্ত্তী, নিকি বাঈজী, ন্যাড়া, মৃত্যুঞ্জয় তর্করত্ন, রূপচাঁদ

পক্ষী, মোতিরায়, বেচারাম। ইংরেজ চরিত্র জন, দুবো, রোজ এলমার, টমাস, কেটি, লিজা, মেরিডিথ। অপরদিকে ইতিহাস খ্যাত চরিত্র রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি। কাহিনীর সঙ্গে চরিত্র কার্যকারণসূত্র যুক্ত হয়ে উপন্যাসটি অনন্যতা দান করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসটির আঙ্গিক সচেতনতা অনন্যতা দান করেছে। কাহিনী গ্রন্থনে, দৃষ্টিনন্দন বর্ণনাভঙ্গিতে, চরিত্রায়ণ পদ্ধতি, কাব্যগুণ ও নাট্যগুণে ও ভাষার বিশ্লেষণে বঙ্গসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

'লালকেল্লা'
উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

'লালকেল্লা' উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার করতে গিয়ে গঠনরীতি, উপস্থাপন কৌশল, চরিত্রচিত্রণ ও ভাষাবিন্যাসই মূল আলোচ্য বিষয়। পরিচিত জগতের উপাদানের সঙ্গে কল্পনার সুষম মিশ্রণে ও লেখকের রচনাশক্তির নৈপুণ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠকমনে রসসঞ্চার সৃষ্টি করে। 'লালকেল্লা' উপন্যাসের কলাকৌশল বিশ্লেষণে আদি মধ্য ও অন্ত সম্বলিত প্লট কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে তুলে সুনির্দিষ্ট পরিণামের দিকে এগিয়ে গেছে। জীবনের বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে বর্ণনা, ঘটনা ও চরিত্র চমৎকারিত্ব দান করেছেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনা এর সঙ্গে ঐতিহাসিক কল্পনার মিশ্র কাহিনী যুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্যতা, ঘটনার বাহুল্য, রাজকীয় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, মহিমান্বিত আত্মদান প্রেমবোধ প্রভৃতি বিষয়কে প্রমথনাথ শিল্পাঙ্গিকে

রূপায়িত করেছেন। মুঘল যুগের রাজকাহিনীকে উদ্ধার করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষকের মত অসংখ্য উপাদান বিভিন্ন কৌণিক বিন্দু থেকে তুলে ধরেছেন। যুগোপযোগী আঙ্গিক প্রকরণে প্রমথনাথের মুন্সীয়ানার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

উপন্যাস সেটিং এর শিল্প সম্মত রূপদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি কথা সাহিত্যিক সচেতন। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য কাহিনীধারার সঙ্গতি সাধন। ঘটনা প্রবাহ মাঝপথে যেন অসঙ্গতি সৃষ্টি না করতে পারে সেদিকে ঔপন্যাসিককে লক্ষ্য রাখতে হয়। গঠন পরিকল্পনার দিক থেকে 'লালকেল্লা' উপন্যাসটি অভিনবত্বের দাবী রাখে। ৪৮৮ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাসটিকে লেখক তিন ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে আবার খন্ডে ভাগ করেছেন। প্রতিটি খন্ড আবার কতকগুলি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন। প্রথম ভাগে তিনটি খন্ড, দ্বিতীয় ভাগে তিনটি খন্ড এবং তৃতীয় ভাগে দুটি খন্ডে ভাগ করেছেন।

প্রথম ভাগের প্রথম খন্ডে সতেরোটি অধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ডে পনেরোটি অধ্যায়,তৃতীয় খন্ডে ষোলটি অধ্যায়ে ভাগ করে প্রথম ভাগের সমাপ্তি টেনেছেন।

দ্বিতীয় ভাগের তিনটি খন্ডের মধ্যে প্রথম খন্ডে উনিশটি অধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ডে ষোলটি অধ্যায় এবং তৃতীয় খন্ডে বারটি অধ্যায়ে ভাগ করে দ্বিতীয় খন্ডের সমাপ্তি টেনেছেন।

তৃতীয় ভাগের খন্ড সংখ্যা দুটি। প্রথম খন্ডে বারটি অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ড চারটি অধ্যায়ে ভাগ করে কাহিনীর সমাপ্তি টেনেছেন।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের অধ্যায়গুলির নামকরণে অভিনবত্বের দাবী রাখে একারণেই এখানে কিছু কিছু নামকরণ ঘটনার সংক্ষিপ্তসার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু বেশির ভাগই উর্দু কবিতার ছত্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, আবার কখনো Faust, Browning, Hardy, Yeats, Wordsworth, মহাভারতের শ্লোক, বঙ্কিম উপন্যাসের লাইন ও ফারসী কবিতার

ছত্র তুলে ধরে কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের এই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী অভিনবত্বের দাবী রাখে।

লেখক ঘটনাজটিল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ব্যক্তিচরিত্রের মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। কাহিনীর চমৎকারিত্ব ও প্লটের চাতুরী উপন্যাসটিকে অনন্যতা দান করেছে।

নাট্যায়ণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও যুদ্ধবিগ্রহের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের রূপরীতি। মহাকাব্যিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যুগসন্ধিকালের চিত্র পরিবেশন। শাহজাহানাবাদের বাদশা বাহাদুর শাহের পরাজয় ও ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় এরূপ একটি যুগসন্ধিকালের ঘটনা নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস। মহাকাব্যিক উপন্যাসের মত প্রসারিত কাল, বিস্তৃত স্থান শাহজাহানাবাদ ও লক্ষ্মৌ, বিশাল পটভূমি, অজস্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্র এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, সাধারণ স্তরের মানুষকে নায়ক করে এক অভিনব আঙ্গিকের প্রবর্তন করলেন যেখানে মহাকাব্যিক উপন্যাসের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় নি।

গতানুগতিক ধারা থেকে প্রমথনাথ 'লালকেল্লা'উপন্যাসে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন। কাহিনী পরিবেশন, বাচন কৌশল ও বর্ণনাভঙ্গী এখানে অভিনবত্বের দাবী রাখে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে শাহজাহানাবাদের বাদশা বাহাদুর শাহ ও তার উজীর, মীর আদল, মীরবক্সী, শাহজাদা, বাঁদী বেগম প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থাপনায় বাদশাহী পরিমন্ডল গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবনলাল। ঔপন্যাসিক জীবনলালের দৃষ্টিতে কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অপরদিকে উপকাহিনী রূপে সুখানন্দের পরিবার, নয়নচাঁদ, তুলসী, ভূতিবুড়ীর ঘটনাংশ মূল কাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণ পরম্পরায় যুক্ত হয়েছে। ইংরেজ চরিত্র হিসেবে কর্ণেল, মেজর, বিগ্রেডিয়ার, জেনারেল প্রভৃতি সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী

উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। হডসন, নিকলসন, ব্রিজম্যান চরিত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সরাব মিঞা ও স্বরূপরামকে দুই ভিন্ন পক্ষ অবলম্বনকারী ফৌজ হিসেবে আমরা পাই। পান্নাবাঈ, রুমালীবাঈ, খুরশিদ জান প্রভৃতি চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাধারার সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে যুক্ত হয়েছে। জীবনলাল স্বয়ং পান্না, রুমালী ও তুলসী এই তিন নারী চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে একদিকে ইংরেজ শক্তি ও মোঘল শক্তির বিপ্লবের বীভৎসরসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোমান্টিক প্রণয়আখ্যান। চরিত্র নির্মিতিতে ও কাহিনী গঠনেও পরিচ্ছেদের নামকরণে ও বর্ণনায় প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের রীতিকে বেছে নিয়েছেন সন্দেহ নেই।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের শুরু হয়েছে লক্ষ্মৌ শহরের অনুপম বর্ণনা দিয়ে, উপন্যাসের নায়ক জীবনলাল লক্ষ্মৌ ছেড়ে শাহজাহানাবাদের দিকে যাত্রা করেছে। গোমতি নদী পেরিয়ে শেষ বারের মতো প্রসাদ নগরী লক্ষ্মৌ এর দৃশ্যটি দেখে নিয়েছে। কাব্যধর্মী ভাষায় শহরের বর্ণনাটি লেখকের কলমে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

লেখক উপনাসের সমাপ্তি টেনেছেন বিয়োগান্তক ঘটনা দিয়ে। হডসনের বন্দুকের গুলিতে জীবনলালের মৃত্যুর খবর তুলসী জানতে না পেয়ে জীবনলালের সঙ্গে তার আসন্ন বিয়ের প্রস্তুতি হিসেবে আলপনা অঙ্কন বিয়ের পিঁড়িতে চিত্রাঙ্কন করে অনন্ত প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। গুরুবচনের পদধ্বনিকে জীবনলালের পদধ্বনি ভেবে আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে পান্না ও তুলসী। এক ট্র্যাজিক পরিণতি দিয়েই লেখক উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

উপন্যাসের আঙ্গিকে অতিলৌকিকতা, চিঠিপত্র, কিংবদন্তী, ছড়া, গজল, মহাভারতের শ্লোক প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক কাহিনীগঠনের ক্ষেত্রে এই উপকরণগুলিকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। উপন্যাসের ঘটনাধারায় কাহিনীর গতিকে

বাঁক পরিবর্তন বিন্দুতে পৌঁছাতে স্বপ্ন ও চিঠিপত্রের উপযোগিতা আছে এতে সন্দেহ নেই।

উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণে অতিলৌকিক উপাদানের সংযোজন প্রাচীন রীতির হলেও আধুনিক সাহিত্যে অতিলৌকিক উপাদানের অভাব নেই। কথাশিল্পী প্রমথনাথ 'লালকেল্লা' উপন্যাসে স্বপ্নদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন যা উপন্যাস কাহিনীর গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রথম স্বপ্নটি দেখেছে নায়ক জীবনলাল। স্বপ্নটি উপন্যাসের প্রথম খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে। স্বপ্নের বিষয় একটি ঠান্ডা মাথায় খুনের ঘটনা। চার পাঁচজন লোক মিলে একজন বলবান লোককে গলাটিপে মেরে ফেলেছে। হঠাৎ পিতার আবির্ভাবে একজনকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে। দুঃস্বপ্নে দুশ্চিন্তায় জীবনলাল লক্ষ্মৌ ছেড়েছে। পরবর্তীতে পিতার দেয়া তক্তির লেখা থেকে জানতে পেরেছে এই খুনের নায়ক সুখানন্দ পন্ডিত। স্বপ্নটি উপন্যাসের রসহানি ঘটায়নি।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছে রুমালী। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার উদ্দেশ্যে একটি গান পরিবেশন করছে আবার কৃষ্ণের কাছে রাধা মিনতি করে গাইছে গান পরক্ষণেই দেখেছে সম্মুখে দাঁড়িয়ে জীবনলাল ও তুলসী, রুমালীর দেখা স্বপ্নটি মনস্তত্ত্বসম্মত সন্দেহ নেই।

তৃতীয় স্বপ্নটি দেখেছে তুলসী। সোনালী সুতো দিয়ে পদ্ম, গোলাপ ও নানা বর্ণের ফুল তোলার দৃশ্য। জীবনলালের সঙ্গে তার প্রণয় উন্মেষের মুহূর্তের স্বপ্নটি কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত।

চতুর্থ স্বপ্নটিও তুলসীর দেখা। ধবধবে সাদা রাজহাঁসের মুখে স্ফুটনোন্মুখ পদ্মের কুঁড়ি তুলসী রূপ কুঁড়িটিও রাজহাঁসটি ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। হঠাৎ হাঁসটির পেছনে দাঁড়িয়ে জীবনলাল। জীবনলালের সঙ্গে তার প্রেমের টানাপোড়েনে এর সঙ্গে স্বপ্নটি সঙ্গতিপূর্ণ। উপন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্বপ্নটি উপন্যাসের রসহানি ঘটায় নি।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের দুটো চিঠিই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম চিঠিটি লিখেছে জেনারেল

উট্রাম। চিঠি নিয়ে জীবনলালকে দেরাদূনে যেতে বলা হয়েছে। তন্দ্রার ঘোরে চিঠি হারিয়ে ফেললে তোপের মুখে জীবনলালকে বেঁধে রাখবার পর চিঠিখানা ব্রিজম্যান পেয়ে জীবনলালকে মুক্তি দিয়ে কোম্পানীর রেসেলদার পদে নিযুক্ত করে। জীবনলালের ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্রে চিঠিটির গুরুত্ব অত্যধিক সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় চিঠিটি তক্তিথেকে উদ্ধার করা। জীবনলালের পিতা জীবনলালকে জানিয়েছে খুনী সুখানন্দের কন্যাকে কখনও বিয়ে না করতে। চিঠিটি ইংরেজী ভাষায় লেখা হলেও ঔপন্যাসিক বাংলার তর্জমা করেছেন। চিঠিটি শুরু হয়েছে " মাই ডিয়ার জীবনলাল" দিয়ে ও " With blessing your father "শেষ করা হয়েছে। জীবনলাল যখন তুলসীকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প করেছিল সেই মুহূর্তে প্রাপ্ত চিঠির বক্তব্য তাকে নূতনভাবে গড়ে উঠবার পথনির্দেশ দিয়েছে। যদিও পরিশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে তুলসী সুখানন্দের পালিত কন্যা তার সঙ্গে বিয়েতে কোন বাধা নেই। তবুও ঘটনাধারায় চিঠিদ্বয় যে কাহিনীর গতিকে পরিবর্তন করতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের আঙ্গিকে কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। প্রমথনাথ পান্না চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে কিংবদন্তীর অবতারণা করেছেন। রামজানি সম্প্রদায়ের বারাঙ্গনা বৃত্তির পেছনে যে হর পার্বতীর অভিশাপ আছে এরূপ কিংবদন্তী উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এছাড়া আঙ্গিক প্রকরণে ইতিহাস, ভূগোল ও পুরাণ চেতনাকে উপন্যাসে স্থান দিয়ে শিল্পোৎকর্ষতা দান করেছেন এটা বলাবাহুল্য।

উপন্যাসের গঠনরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে জনপ্রিয় গজল গান, তুলসীদাসী রামায়ণের শ্লোক, মীরার ভজন, বৈষ্ণব পদাবলীর পদ, মহাভারতের শ্লোকগুলি শিল্পোৎকর্ষের দাবী রাখে। 'লালকেল্লা' উপন্যাসে মোট গজল গানের সংখ্যা চব্বিশটি। উপন্যাসের আঙ্গিক

প্রকরণে গান ও শ্লোকগুলোর ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

লালকেল্লা উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে নাট্যগুণের অভাব নেই। 'লালকেল্লা' মোঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বাদশা বাহাদুর শাহের বির্পযয় এবং ইংরেজ কোম্পানীর উত্থানের পটভূমিকায় সিপাহী বিদ্রোহোত্তর শাহজাহানাবাদের উত্থান পতনের নাটকীয় আলেখ্য। অবক্ষয়িত সাম্রাজ্যের উত্থান পতনে হত্যা, ষড়যন্ত্র, শঠতা প্রবঞ্চনা নারী নির্যাতন, লুঠতরাজ, গুপ্ত হত্যা, নারী অপহরণ, যুদ্ধের উন্মত্ত দামামা, প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত প্রত্যেকটি ঘটনাই নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। উৎকণ্ঠা, চমক, আকস্মিকতা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নাট্যগুণ লালকেল্লা উপন্যাসটিকে শৈল্পিক মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলেছে।

তোপের মুখ থেকে জীবনলালের মুক্তি ও রেসেলাদার পদে নিযুক্ত হবার ঘটনা নাটকীয় আকস্মিকতা সৃষ্টি করেছে। নাটকীয় চমক সৃষ্টি হয়েছে নিম্নোক্ত ঘটনায়। বস্তাবন্দী লাস যমুনাগর্ভে ফেলে দেবার জন্য রাতের অন্ধকারে যমুনার চরে আনা হলে সেই মৃতের শ্মশানে নিদ্রাগত দুটি ব্যক্তি হাকিম সাহেব ও স্বরূপরাম। জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনের আকস্মিক পরিচয় আমাদের চমক সৃষ্টি করে। প্রমথনাথ নাটকীয় চমক সৃষ্টিতে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। মুমূর্ষু সুখানন্দ তুলসীর পরিচয় জানতে গিয়ে - " নৈনিতাল জেলায়, পাহাড়ের কাছে, বনের ধারে, গাঁয়ের নাম . . . " এটাই ছিল তার শেষ বাক্য। অসম্পূর্ণ এই বাক্যটি পাঠকমনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। এরূপ নাটোৎকণ্ঠা সৃষ্টিতেও প্রমথনাথ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

নাট্যদ্বন্দ্বের সার্থক প্রতিফলন উপন্যাসটিতে জীবন্ত রূপদান করেছে নিম্নোক্ত অংশে। দিন দুনিয়ার মালিক বাদশা বাহাদুর শাহ, বেগম সাহেবা সহ বন্দী, হুমায়ুন কবরের পাশে তার আশ্রয়। সংবাদ পেয়েছিল তাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে লালকেল্লায়। ইচ্ছে করলে কুলি

খাঁর পরামর্শে শাহজাহানাবাদ ছেড়ে যমুনা পেরিয়ে লক্ষ্মৌ চলে যেতে পারতেন। অশীতিপর বৃদ্ধ বাদশা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হাজার স্মৃতি বিজরিত লালকেল্লা ছেড়ে যেতে পারেন নি। পরাজিত হৃত সর্বস্ব সিংহাসন চ্যুত বাদশার ঘরের এক কোনে মাটির কলসীতে জল, খাপরায় দুখানা রুটি। বাঁদী খানসামা নেই। হতভাগ্যের মত লালকেল্লায় চিরপরিচিত ইমারতগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেছেন দরজার মাথায় ইংরেজ কোম্পানীর ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে সর্বত্র, দুঃখে, বেদনায় মুখ ঘুড়িয়ে নিলেন বাহাদুর শাহ। তার অতি প্রিয় বুলবুল পাখিটিও তার কাছে আসে নি। নৈরাশ্য পীড়িত হতভাগ্য বাদশার এই ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠকমনে করুণার উদ্রেক করে। শতস্মৃতি বিজরিত লালকেল্লা, অতীত ঐতিহ্যবাহী লালকেল্লা ছেড়েও যেতে ইচ্ছুক না হলেও ইতিহাস দেবতার অঙ্গুলি নির্দেশে শূণ্য পড়ে থাকে দিল্লীর মনসদ।

উপন্যাসে নাট্যগুণ আমরা প্রত্যাশা করি কিন্তু যেহেতু উপন্যাস ও নাটক সমগোত্রের নয় এ ব্যাপারে লেখক সচেতন। তবুও কিছু কিছু নাট্যধর্মী বৈশিষ্ট্য উপন্যাসকে শিল্পোৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে সন্দেহ নেই।

'লালকেল্ল' উপন্যাসে বর্ণনামূলক গদ্যরীতির স্বচ্ছন্দ লেখনী গতিশীল রূপ লাভ করেছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে চরিত্রানুগ, দৃশ্যানুগ ও নাট্যনুগ বর্ণনায় লেখক শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

লালকেল্লার বর্ণনা ঃ

" লালকেল্লার অষ্টকোণ গড়, লম্বায় তিন হাজার প্রস্থে আঠারোশ ফুট প্রাচীরের ব্যাস দেড় মাইল, নদীর ধারে প্রাচীর ষাট ফুট উঁচু, অন্যদিকগুলোর প্রাচীরের উচ্চতা একশ দশ ফুট; পচাঁত্তর ফুট চওড়া, ত্রিশ ফুট গভীর গড়খাই দিয়ে বেষ্টিত, পূর্ব দিক রক্ষা করছে দূরতিক্রম্য যমুনা, কেল্লার দক্ষিণ দিকে লাহোরী দরবাজার অনুরূপ দিল্লী দরবাজা। [৮০]

ইতিহাস সচেতন শিল্পী প্রমথনাথ এখানে লালকেল্লার বর্ণনায় ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে পরিবেশ সৃষ্টির নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লালকেল্লার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা কোণ যেমন বর্ণনা করেছেন তেমনি দরজা ও প্রাচীরের বর্ণনা দিতে ভোলেন নি। দৃশ্যানুগ বর্ণনায় লেখকের সাফল্য অসামান্য।

প্রমথনাথ 'লালকেল্লা' উপন্যাসে ভারতবর্ষের মানচিত্রের বর্ণনার মধ্যে এনেছেন অভিনবত্ব ঃ

" ভারতবর্ষের মানচিত্রখানার দিকে একবার ভাবনেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো, দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই ভৌগোলিক ভূখন্ডে দেবাতাত্মা, দেখতে পাওয়া যাবে যে, মহাকাশ এখানে তান্ডব নৃত্যে নিরত। ঐ সুদূর দক্ষিণে পামীর গিরিচূড়ায় তার জটার গ্রন্থি, যুগান্তের ঝঞ্ঝায় তাঁর জটাজাল ছড়িয়ে গিয়েছে দিকে দিকে; উত্তরে দুটো পশ্চিমে দুটো আর পূর্ব দিকে বিস্তৃত যে বৃহৎ জটাজাল, তারই নাম হিমালয় গিরিমালা। ঐ যে তাঁর বাম করে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার ত্রিশূল আর ঐ যে দক্ষিণ করে পঞ্চসিন্ধুর গর্জনে তার ডমরুর গরগর ধ্বনি। তাঁর এক চরণ দাক্ষিণাত্যে প্রসারিত, অপর চরণ বঙ্গোপসাগরের পূর্বোপকূলে। আর তার কণ্ঠে দোদুল্যমান স্ফটিকের মাল্যনিচয়, গঙ্গা যমুনা, সরযূ, গন্ডক, কুশী। ঐ দ্যাখো তাঁর কটিবন্ধে বিন্ধ্য গিরিমালার বন্ধনী। যুগনৃত্যে নিরত মহাকালের মূর্তি একবার নিরীক্ষণ করো, মৃন্ময়ের চিন্ময়ীকরণ হোক। "[৮১]

- গিরি চূড়া, জটাজাল সদৃশ হিমালয় গিরিমালা থেকে পঞ্চসিন্ধুর গর্জন ধ্বনি, কর, চরণ, কটিবন্ধ , কণ্ঠ যেন এক চিন্ময়ী সত্তা। কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ভারত মানচিত্রের বর্ণনা লেখকের কৃতিত্বের দাবী রাখে।

বাদশার বৈঠকখানার বর্ণনা ঃ

" বাদশা একখানা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট, বাঁদিকে শ্বেত পাথরের মেঝের উপরে রূপোর ডিবেতে পান, পায়ের কাছে রূপোর পিকদান, হাতের কাছে সোনার মুখনলওয়ালা গড়গড়ার নল, আর কোলের উপর দামী সবুজ রঙের মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতা, বাদশার লিখিত গজল পূর্ণ। " [৮১]

কথা সাহিত্যিক প্রমথনাথ বাহাদুর শাহের বৈঠকখানার যে পরিবেশ উপস্থাপন করেছেন আরাম কেদারা, শ্বেতপাথরের মেঝে, রূপোর পান, ও পিকদান, সোনার মুখযুক্ত গড়গড়ার নল, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো খাতা প্রভৃতি বাদশাহী পরিবেশের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ।

আবেগধর্মী সংলাপরীতিটি পাঠকমনে কতটা অনুভূতি জাগাতে পারে তার সার্থক নির্দশন নিম্নোক্ত সংলাপটি ঃ

" জীবন, জীবন, তুমি আমার সব, তুমি আমার সর্বস্ব, যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে চল, যা খুশি আমাকে শাস্তি দাও, আমাকে মারো, আমাকে খুন করে ফেলো, শুধু বল যে আমাকে ভালবাসো। জীবন, আমি পাপিষ্ঠা, আমি স্বৈরিণী, আমি নারকী, তবু আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে ফাঁসিকাঠে চড়িয়েছি, তোমার বিবাহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছি, আমার পাপের অন্ত নাই। কিন্তু জীবন যিনি পাপ সৃষ্টি করেছেন , তিনি কি প্রেম সৃষ্টি করেন নি ? যিনি নরক সৃষ্টি করেছেন তিনি কি স্বর্গ সৃষ্টি করে নি ? যিনি তুলসীকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি রুমালীকে সৃষ্টি করেন নি ? না, না, জীবন, আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না। ভাই, আমার অঙ্গে অনেক কলঙ্ক কিন্তু আমার প্রেম নির্মল। " [৮৩]

- রুমালী ভালবেসেছিল জীবনলালকে। রুমালীর অপর প্রতিদ্বন্দ্বী তুলসীকে ভালোবেসেছিল জীবনলাল। রুমালীর আর্তি কতটা মর্মস্পর্শী, কতটা আবেগধর্মী ও নাটকীয় লেখকের বর্ণনায় তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবনলালের প্রতি রুমালীর এই আর্তি শুধু

রুমালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বের চিরন্তন ব্যর্থ প্রেমিকার আর্তি ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরীতি ঃ

" ঘর অন্ধকার, আলো জ্বালাবার আয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই, খরচ কমাতে হবে, লড়াই করতে অনেক খরচ হয়েছে কিনা। বাদশা ভাবেন ভালোই হল, নিজের কাছ থেকে লুকোবার এই তো সুযোগ। বাদশা নেই, বাদশাহী নেই, বাদশাহের রাজগী নেই, অন্ধকারের স্নেহময় পর্দা ঢেকে দিয়ে সব লজ্জা, সব দুর্ভাগ্য, সমস্ত ভবিষ্যৎ। ধন্য, ধন্য অন্ধকার।" [৮৪]

অসহায় বাদশা অন্ধকারে বিলীয়মান লালকেল্লার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন। অতীত ঐতিহ্যবাহী লালকেল্লার ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন সুনিপুণভাবে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে লেখকের মূল্যবান মন্তব্য, জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবনের অভিজ্ঞতাপূর্ণ আপ্তবাক্যগুলি চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করেছে। সংক্ষিপ্ত বা বিদ্রূপাত্মক উক্তি ও পরিহাসগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১) " নারী ও লতা আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না, যে আশ্রয় কাছে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে।" [৮৫]

২) " চোখের জলে মেয়েরা সুন্দর, পুরুষে বিব্রত।" [৮৬]

৩) " পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি নারী - সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" [৮৭]

৪) " মৃত্যুকে যে ভয় করেনা সে হয় দেব নয় দৈত্য।" [৮৮]

৫) " সুখে মানুষে মানুষে ব্যবধান, দুঃখে মানুষে মানুষে মিল।" [৮৯]

৬) " সুখের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলে বাড়ে, দুঃখের অভিজ্ঞতা কমে।" (পৃঃ ২৫২)

৭) " পিত্তরোগীর মুখে সুখাদ্যও তিক্ত।" (পৃঃ ২৬৫)

৮) " বিপদের সময় চাঁদের আলো বন্ধু হয়।" (পৃঃ ২৭২)

৯) "প্রেমের উৎস স্মৃতি। তুচ্ছ কথার নুড়ির উপর দিয়ে প্রেমের ঝরণার যাত্রা শুরু হয়।"(পৃঃ ২৭৬)

১০) " আপনি আত্মীয়তা বৈঠকখানা, 'তুমি' আত্মীয়তা অন্দরমহল।" (পৃঃ ২৯২)

১১) " প্রণয়ের জগৎ নির্জন, সেখানে দুটির বেশি প্রাণীর জায়গা নেই।" (পৃঃ ৩০৫)

১২) " প্রেমের বিশ্বব্যাপী মহিমা, নক্ষত্রলোক থেকে পৃথিবীর অনু পরমানু তার শাসনে নিয়ন্ত্রিত।" (পৃঃ ৩৩৪)

১৩) " পাপের আগুন শুধু পাপীকে নয় তার পরিবেশকেও দগ্ধ করে।"

১৪) " নিজের জন্য দুঃখ ভোগ প্রেমের ফুল আর অপরের জন্য দুঃখবোধ প্রেমের ফল।" (পৃঃ ৪০৪)

১৫) " ঘটনার চেয়ে ঘটনার স্মৃতি বেশি ভয়াবহ হয়।" (পৃঃ ৪৫৮)

১৬) " রূপকে ধুয়ে মুছে গুছিয়ে সযত্নে রক্ষা করতে হয়, সৌন্দর্য আপন স্বভাবে নিত্যনবীন। রূপ কাগজের ফুল, একটুখানি হাওয়া, একটুখানি ধুলো লাগলে মলিন হয়। আর সৌন্দর্য সরোবরের শতদল, ধুলো যার উপরে পত্রলেখা আঁকে, ঝোড়ো বাতাস তার দলগুলিকে আরো বেশি উন্মীলিত করে দিয়ে অবারিত করে দেয় রহস্যময় মধুকোষ। রূপ মানবীয়, সৌন্দর্য দেব।" (পৃঃ ৪৮৫)

'লালকেল্লা' উপন্যাসের বাক্যগুলি কোনটি ছোট, কোনটি মাঝারি আবার কোনটি বড় ধরণের বাক্য।

নিম্নোক্ত সংলাপটিতে প্রত্যেকটিই এক একটি ছোট বাক্য —

" কে ও ?

আমি।

আমি কে? রুমালী নাকি ?

হ্যাঁ, জীবনলাল।

এত রাতে এখানে, কি ব্যাপার ?

তোমাকে দেখতে এসেছি।'' (পৃঃ ৪২৭)

— এখানে জীবনলাল ও রুমালীর কথোপকথনে উদ্ধৃত বাক্যগুলি ছোট। 'কে ও', 'আমি', 'আমি কে?' এগুলো প্রত্যেকটিই ছোট ছোট বাক্য। ভাষার অন্তরাংশ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে ছোট বাক্যগুলি।

মাঝারি ধরণের একটি বাক্য প্রদত্ত হল ঃ

'' নয়নের ডাক শুনে চট্ করে হাত দিয়ে এলোমেলো চুলগুলো একটু সাব্যস্ত করে নিয়ে পাশের ঘরে যায় - দেখে, চুড়িদার পায়জামা, কলিদার পিরান, তার উপরে হাতকাটা খাটো কোর্তা, মাথায় টেরা করে বসান ফুলকাটা লখনৌবালা টুপি, হাতে সারেঙ্গী - মূর্তিমান সারেঙ্গীঅলা জীবনলাল, কে বলবে, সে কোম্পানীর রেসেলাদার।'' (পৃঃ ৩৮০)

বাক্যটিতে দুটি হাইফেন, চারটি কমার পর বিরাম চিহ্ন বসেছে। বাক্যের ঐক্যবোধ নির্ভর করে ধ্বনিতে, ধ্বনিপুঞ্জে, বিরতিচিহ্ন, কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, সেমিকোলন, শব্দ, শব্দ বিন্যাসের উপর। সাতটি ক্রিয়াপদ নিয়ে গঠিত হয়েছে বাক্যটি।

বড় ধরণের বাক্যের অভাব নেই। যেমন ঃ

'' কিন্তু এখন যখন সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে, আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে পাখির ঝাঁক যমুনার দিক থেকে দলে দলে উড়ে চলেছে, এই পাহাড়, ঐ সবজিমন্ডিত বাজার, ঐ রোশেনারাবাগের গাছপালা, ঘনান্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে রেখামাত্র সার হয়ে শেষ অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে, আর একে একে ধীর পদে বের হয়ে আসছে গুপ্ত

আকাঙ্ক্ষা, গুপ্ত স্মৃতির দল, নিয়মের দৃঢ়দৃষ্টি আলগা করে দিয়ে দেখা দিচ্ছে স্ফুটমান তারকারাশির ন্যায় গোপন অভিলাষ আর অভিলম্বিত বস্তু, তখন জীবন যেন অনুভব করলো, সে অনুভূতি একটা উপচ্ছায়া মাত্র, কোথায় মনের কোন গহন গভীরে মুখ তুলে দেখা দিয়েছে সঙ্কোচে ছোট্ট একটুখানি অস্ফুট আনন্দের কুঁড়ি।" [৯০]

বাক্যটিতে নয়টি কমার পর বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। মোট তেরটি সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত বৃহৎ বাক্যটি। প্রমথনাথ ইচ্ছে করলে ছোট ছোট বাক্যে বিন্যস্ত করতে পারতেন, লেখক তা করেন নি।

নঞার্থক অব্যয় যোগে বাক্যবিস্তৃতি ও ভাবসমুন্নতি সৃষ্টি করেছেন। যেমন -

" তোমার ভাগ্যে সুখ না জুটে যদি অপরের ভাগ্যে জুটে থাকে, সে দোষ কি অপরের? দুর্ভাগ্যের উপরে আর ঈর্ষার পাপে পাপী হয়ো না। (পৃঃ ৪২০)

" কামান বন্দুক থেকে তো আতর গোলাপ জল ছিটায় না।" (পৃঃ ৪৬৫)

" না বাদশা নির্বোধ নন।" (পৃঃ ৪৬৪)

" নাঃ, জীবনপাত্রের তলানি পর্যন্ত কিছুতেই পৌঁছাতে পারা যায় না।" (পৃঃ ৪১৩)

প্রথম দুটি বাক্যে নঞার্থক অব্যয় শেষে এবং পরের দুটি বাক্যের নঞার্থক অব্যয় সামনে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহারিক বৈচিত্র্যও কম নয়। যেমন ঃ

(ক) " উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ব্রিজম্যান, শুধালো কি ব্যাপার ?" (পৃঃ ২৪৯)

(খ) " কে গেল কিছু জানা গিয়াছি কি?' (পৃঃ ২৪৯)

(গ) "এই চিঠি খানা কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?" (পৃঃ ২৪৬)

(ঘ) "বেয়াদপ তুমি শাহজাদাকে হুকুম্ করবার কে ?" (পৃঃ ২৭৬)

'লালকেল্লা' উপন্যাসের সমাসবদ্ধ পদ ঃ

রশ্মিরেখা, অতলস্পর্শ, নয়নমণি, পূর্ণোন্মাদ, স্ফুটনোন্মুখ, তুষারনির্মল প্রভৃতি।

লেখক সার্থকভাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির প্রয়োগ করেছেন। যেমন -

জ্বলজ্বল, গটগট, খটখট, গুনগুন, ঝকঝক, বনবন, হাউহাউ, কড়কড়, হৈ হৈ, চকচক, গাইগুই, খসখস, তরতর, মস্‌মস্‌, গলগল, গড়গড়, থরথর, গজগজ, ঝনঝন, ঝাঝা, টকটক, ছলছল, কলকল, ছপছপ, ঝটপট, গটমট, দুমদুম, হোঃ হোঃ প্রভৃতি।

নতুন শব্দ বা এপিটোনের ব্যবহার - মামাদোবাজি, বৈকুণ্ঠের সীমান্ত, চাখা প্রভৃতি।

তৎসম শব্দ - স্বধর্মভ্রষ্ট, মাধুর্য প্রভৃতি।

তদ্ভব শব্দ - বুড্‌ডা, চন্‌দ্রিমা প্রভৃতি।

বিদেশী শব্দ - দিলমঞ্জিল, তোবা, বাহাবাহা,, তাঞ্জাম, হারেম, ভলন্টিয়ার, কুর্নিশ, এজলাস, খালাস, রেসিডেন্সি। প্রভৃতি।

আপাত অশ্লীল শব্দ মনে হলেও প্রমথনাথের কলমে অশ্লীল শব্দগুলির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন -

(ক) " শালা ডাকুলোক চড়াও হয়েছে আফিঙ গোলার উপরে।" (পৃঃ ১০)

(খ) " শালা ঠিকাদার মারবে নাফা আর আমি ধরবো লাঠি।" (পৃঃ ১০)

(গ) " মর মাগী, দুটো কথা বল।"

শালা, মাগী এধরণের অশ্লীল শব্দের দৃষ্টান্ত উপন্যাসের রসহানি ঘটায় নি।

ঔপন্যাসিক ইংরেজী সংলাপ ও ইংরেজী বাংলা মিশ্র সংলাপ এবং আঞ্চলিক ভাষাকেও সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন।

ইংরেজী সংলাপ ঃ

(ক) " আই অ্যাম সরি টু রিফিউজ ইওর ফাইভ অফার।"

(খ) "I like smiling faces. who are you?" (পৃঃ ২)

(গ) আঞ্চলিক ভাষা ঃ যশোহর জেলার আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার -

শোও অ্যানে বাবা।

এত রাতে আবার কনে চললে? (পৃঃ ১১৮)

'লালকেল্লা' উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার করতে গিয়ে যে প্রসঙ্গটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে তা হল ভাষার ব্যবহার। বর্ণনা অংশ ও সংলাপ অংশ দুটিতেই লেখক চলিত ভাষার সাহায্য নিয়েছেন।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের বিশেষণগুলোও মাধুর্য ও ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তুলেছে। যেমন -

বাষ্প ইন্দ্রধনু, তন্ময় পদ্মকোরক, বুটের মসমস আওয়াজ, তন্দ্রাতুরের নিদ্রা, নিশীথের নিস্তব্ধতা, শব্দের প্রেতাত্মা, সুগন্ধি পুরী, রক্তিম অধরোষ্ঠ, স্নিগ্ধ অকম্পিত জলতল প্রভৃতি।

লেখক উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

চরিত্রের রূপাঙ্কনে উপমার সার্থক ব্যবহার ঃ

" খুরশিদ বড় সুন্দর, অস্তগত সূর্যের রশ্মিলাবণ্যে মার্জিত আকাশে নবোদিত সন্ধ্যাতারা যেমন সুন্দর তেমনি।" (পৃঃ ৪৩৮)

চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক উদ্‌ঘাটনে উপমার প্রয়োগ ঃ

(ক) " সমস্ত পৃথিবী তার চোখে সাপের খোলসের মতো আজ নিরর্থক।" (পৃঃ ৪৪৬)

(খ) " ছিন্নমূল লতার মতো তুলসী লুটিয়ে পড়ে ডুকরে কাঁদতে লাগল।" (পৃঃ ৪৪১)

পরিস্থিতি চিত্রণে উপমার প্রয়োগ ঃ

" এমন সময়ে সৌভাগ্যের নৈবেদ্য চূড়াটির মতো সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, একেবারে পুত্র

সন্তান।"

প্রকৃতি চিত্রণে উপমার ব্যবহার ঃ

(ক) জ্যোৎস্নার আলোয় দিনের বেলাকার প্রবালের প্রাচীর এখন চুনীর আভার মতো জ্বলছে। (পৃঃ ২৫৪)

(খ) যমুনার নীল জল রাতের অন্ধকারে ঘন কালো, একটানা ছলছল কলকল ধ্বনি প্রকান্ড একটা বিলাপের মতো, এখানে ওখানে আলোর ফুটকি, কতক আকাশের তারা কতক জনপদের আলো, কতক মনের মরীচিকা। (পৃঃ ৩৩৬)

প্রমথনাথ উত্তমপুরুষে চরিত্রের মুখে 'আমি' জবানীতে গল্প পরিবেশন করেছেন। যেমন

(ক) " যদি সংবাদ পাও যে আমি মারা গিয়েছি তবে ঐ পিস্তলটা দেখলে মাঝে মাঝে আমাকে মনে পড়বে।" (পৃঃ ২৮৮)

(গ) মুখে বলে কে তুলসীবাঈ, আমি চিনি না তাকে। (পৃঃ ২৮৯)

(ঘ) আমি নিশ্চয় জানি নে। (পৃঃ ৪৩১)

এইভাবে 'আমির' জবানীতে সংলাপ অংশ উপস্থাপন করেছেন লেখক।

পরিশেষে বলা যায় বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকের ভারসাম্য বজায় রেখে প্লট, চরিত্র, ভাষা ও উপস্থাপন রীতি সব মিলিয়ে ইতিহাস তার অতীতের প্রচ্ছদ খুলে ফেলে বর্তমানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক অভিনব আঙ্গিকের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন 'লালকেল্লা' উপন্যাসে। এখানেই লেখকের মৌলিকত্ব নিহিত।

'বঙ্গভঙ্গ'

উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

উপন্যাসের গঠন কৌশল, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা বিন্যাস ও উপস্থাপন রীতির বিচার বিশ্লেষণ হল আঙ্গিক নির্ণয়ের প্রধান উপাদান। প্রমথনাথ বিশীর 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই যে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে তা হল গঠন রীতির বিশ্লেষণ।

উনচল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত সর্বশেষে পরিশিষ্ট অংশ নিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের বহিরঙ্গ গঠনবিন্যাস। পূর্ববর্তী রচনা 'লালকেল্লা'য় ভাগ খন্ড ও অনুচ্ছেদে তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করে কাহিনীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছেন। আবার 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসখানি পাঁচটি খন্ডে ৮৭ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদেরে শুরুতে একটি করে পরিচয় পত্র দিয়েছেন যা আসলে পরিচ্ছেদের ঘটনাধারার সার অংশ কাহিনী যাতে ঘটনাবাহুল্যে অসঙ্গতির সৃষ্টি না হয় কিংবা পাঠক মনে কৌতূহল সঞ্চারের জন্যই ধারাবাহিকভাবে ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ বেছে নিয়েছেন শিল্পী প্রমথনাথ। 'কিন্তু' 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের গঠন বিন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটালেন নাম বা পরিচয়পত্রহীন ভাবে পরিচ্ছেদ গুলোকে সাজিয়েছেন। শুধুমাত্র পরিচ্ছেদ গুলোকে সংখ্যা নামে চিহ্নিত করে উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের প্রথম দশটি অধ্যায়ের বিষয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমন উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইংরেজ সমর্থন পুষ্ট দেওয়ান, জজ ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল ও শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের ভোজের আয়োজন যার মূল উদ্যোক্তা দিনাজশাহী শহরের ইংরেজপ্রদত্ত রায়বাহাদুর উপাধিধারী যজ্ঞেশ রায়। পুত্র শচীন ও সুশীল মহারাণীর প্রতি অহেতুক ভক্তি ও ইংরেজ তোষণ নীতির ঘোর বিরোধী। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা লোকেশ্বর হাই স্কুলের প্রধান

শিক্ষক দিনাজশাহীর অবিনাশ চক্রবর্ত্তী যজ্ঞেশ রায় আয়োজিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয় নি। অবিনাশ বাবুর স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শচীন ও সুশীল স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শচীন কলকাতার রিপন কলেজে অধ্যয়ন করে। অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সর্বত্র বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের ঝড় প্রবাহিত হয়। এছাড়া অবিনাশ বাবুর জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়তা, কন্যা রুক্মিনীর বিবাহের ব্যাপারে হরিপদ ও বীরেন এর ঘৃণ্য চক্রান্ত, অল বেঙ্গল লোন অফিসে ফৌজদার ও উকিলদের আড্ডার আসর, মিঃ ক্যালেনের অবিনাশ বাবুর উপর বিদ্বেষ, অবিনাশ বাবুকে শিক্ষকতা থেকে বরখাস্ত, স্বদেশী বিষয় নিয়ে ক্লোজেট সাহেবের সঙ্গে বিতর্ক প্রভৃতি ঘটনা মূল প্রতিপাদ্য।

একাদশ থেকে কুড়ি অধ্যায়ে আশুতোষ মুখুজ্জের স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয়তা, রুক্মিণীর বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ, স্বদেশী আন্দোলনের ডাকে হরতাল, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, রাসবিহারী ও টহলরামের বক্তৃতা, হিতভাষী পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র, রাখীবন্ধন উৎসব ও বয়কট আন্দোলনের ডাক, ক্লোজেট সাহেবের ভূমিকা, সুরাট কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুটি দলের আবির্ভাব, শচীনের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ, দিনাজশাহী শহরে বিলিতিকাপড়ের দোকানে পিকেটিং ও বহ্নুৎসব, রায়বাহাদুরের গ্রেপ্তার, গুপ্ত সমিতি গঠন, আলিপুরের বোমার মামলা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

একুশ থেকে ত্রিশ অধ্যায়ে সুশীলের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সক্রিয়তা, নবীন মহাজনের গ্রেপ্তার, বীরেন চৌধুরী , তারাচরণ, হরিপদ প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে ব্যঙ্গরস, সুশীলের সঙ্গে মলিনার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন, গুপ্ত সমিতির কাজে সুশীলের সক্রিয়তা ও দীক্ষাগ্রহণ, শপথ বাক্য পাঠ, দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে বঙ্গদেশে ব্যাপক উত্তেজনা, যজ্ঞেশবাবুর কংগ্রেস দলে যোগদান, নিস্তারিণী, বিন্দুবাসিণী, রুক্মিণী ও মলিনার দেশের চাঞ্চল্যকরঘটনা নিয়ে আলোচনা, পুলিশের হেড কনষ্টেবল হরিপদ দেবের গুলিতে নিহত হবার ঘটনা, সুশীলের পিস্তলের গুলিতে ইংরেজ প্রতিনিধিকে হত্যার দায়িত্বভার অর্পণ, দক্ষিনেশ্বর কালীমন্দিরে

পরমহংস সেজে সুশীলের ধ্যান, রুক্মিণী, মলিনা, শচীন ও রমণীর দক্ষিনেশ্বর কালীমন্দির দর্শন করতে গিযে ধ্যানমগ্ন সুশীলকে দর্শন, রমণী ও মলিনার প্রেম কাহিনী মূল ঘটনা।

একত্রিশ থেকে উনচল্লিশ অধ্যায়ে চরমপন্থী দলের বিপ্লবীদের সহিংস কার্যকলাপ, তার মাঝখান সুশীল ও মলিনার রোমান্টিক প্রেমানুভূতি, বিপ্লবী নেতার সঙ্গে সুশীলের পরিচয় তার নির্দেশ গ্রহণ ও শপথ বাক্য স্মরণ এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরকে হত্যার নির্দেশ, সুশীলের গুলিতে পুলিস ইন্সপেক্টরের খুন, সুশীলের গ্রেপ্তার, রমণীর মৃত্যু ঘটনা, মিঃ মজুমদার ও মিস ফ্লোরের অত্যাচারে চার নম্বর সেলে ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় সুশীলের মৃত্যু, তার অন্ত্যেষ্টিতে অবিনাশ, শচীন,যজ্ঞেশবাবুর উপস্থিতি। এই দুঃসংবাদে নিদারুণ আঘাতে অন্তঃসত্ত্বা রুক্মিণী দুটি যমজ সন্তান প্রসব, একেবারে একরকম বলে যজ্ঞেশবাবু তাদের নাম রেখেছে লব ও কুশ। এই নিয়েই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে কোন উপকাহিনী নেই বলে এটি সরল প্লটের শ্রেণীভূক্ত। বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিকের সুষ্ঠ সমন্বয় ঘটেছে বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে। উপন্যাসটি কাহিনী সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি এখানে প্লটের সঙ্গে নিখুঁত বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। চরিত্রচিত্রণ ও ভাষাবিন্যাস অনেকটা সংযত হয়েছে।

ঘটনাবিন্যাস, পরিবেশ পরিকল্পনা, সংলাপরীতি সব মিলিয়ে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিষয় ও বাস্তবতাবোধের অভাব ঘটেনি বরং পরাধীন ভারতের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন দিনাজপুর, রাজসাহী ও কলকাতার চাঞ্চল্যকর অবস্থাকে কথাকৌশলে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে নতুন টেকনিকের পরিচায়ক।

কাহিনী বিন্যাসে একাধিক চিঠিপত্রের সংযোজন উপন্যাসকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে

সন্দেহ নেই। অবিনাশ বাবুকে উদ্দেশ্য করে শচীনের লেখা চিঠিটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। আরোও একাধিক চিঠি উপন্যাসে স্থান নিলেও কাহিনীধারার গতিকে ত্বরান্বিত করতে চিঠিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে কিছু প্রচলিত ছড়া গান বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এরূপ দু একটি ছড়াগানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি -

(ক) " সোনারে দ্যাশে শয়তান
আইয়া আগুন জ্বালাইল" [৯১]

(খ) " ছিল ধান গোলা ভরা
ক্ষেত ইদুরে করল সারা।" [৯২]

(গ) " ফুলার সাহেব চুলার দূরে কুলার বাতাস খেয়ে,
ও ভাই সারেঙ আপাতত এইটারে যাও নিয়ে।" [৯৩]

(ঘ) " নগরে নগরে জ্বালোরে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দূর্দশা ঘুচারে ভাই।" [৯৪]

তৎকালীন সময়ে এই ছড়াগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আঙ্গিক প্রকরণে ছড়াগানগুলোর সাহিত্যিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

উপন্যাসের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি একটা বিশেষ কলাকৌশল। আঙ্গিক প্রকরণের সময় উক্ত বিষয়টি বিচার্য। 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের শুরু হয়েছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমন উপলক্ষে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথি আপ্যায়নের ঘটনা দিয়ে। যজ্ঞেশ রায় সমাগত শ্বেতাঙ্গ

জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিসের বড় সাহেব, সিভিল সার্জেন, মিশনারী হাসপাতাল ও ছাত্রাবাসের কয়েকজন সাহেব ও নামকরা কয়েকজন উকিলদের হ্যান্ডশেক করছেন। রায়বাহাদুরের পরনে গরদের ধুতি চাদর, মস্তক মুন্ডন করা, শুভ্র উপবীত ধারণ করে রক্তচন্দনের ফোটা দিয়ে নিমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। প্রমথনাথ উপন্যাসের প্রারম্ভেই এক বিশেষ পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন বিয়োগান্তক ঘটনা দিয়ে। যজ্ঞেশ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলের আকস্মিক মৃত্যুঘটনার প্রতিক্রিয়া দিয়ে। মলিনা, রুক্মিনী, যজ্ঞেশবাবু, নিস্তারিনী দেবী, অবিনাশবাবু, শচীন প্রত্যেকেই সুশীলের মৃত্যুতে শোকাহত। সেই সঙ্গে পরিশিষ্ট অংশ যুক্ত করে অন্তঃসত্ত্বা রুক্মিণীর যমজ দুই পুত্র সন্তানের আবির্ভাব ও যজ্ঞেশ রায়ের ও নিস্তারিণীদেবীর শোকাহত হৃদয়ের সান্ত্বনা দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

উপন্যাসে স্থানগত ঐক্য ও কালগত ঐক্য রক্ষা করেছেন।উপন্যাস ঘটনা দিনাজপুর, রাজসাহী ও কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সময় বিন্যাসের ক্ষেত্রেও লেখক সচেতন ঃ

" তখন বেলা একটা, তবে শীতকালের বেলা একটা এই যা।" (পৃঃ ১) " এই নিদারুণ আঘাতের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন আগে তার দুই যমজ পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।" — এখানে বেলা একটা, শীতকাল, কয়েকদিন আগে, 'নির্দিষ্ট সময়' ইত্যাদি সময়বিন্যাসে লেখক শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

স্থানে স্থানে মিথের সার্থক প্রয়োগে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। চৌত্রিশ অধ্যায়ে গীতার ব্যাখ্যায় মিথের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এছাড়া একত্রিশ পরিচ্ছেদে মিথের ব্যবহার —

" কেন শকুন্তলার কাহিনী পড়েনি ? বিশ্বমিত্রের ধ্যানভঙ্গের ফল শকুন্তলা, আর দুষ্মন্তের পুত্র ভরত যার নামে এ দেশ ভারতবর্ষ আর আমরা সেই দেশের অধিবাসী।" [৯৫]

দক্ষিণেশ্বরে সুশীলের ধ্যান প্রসঙ্গে মিথ কাহিনী পরিবেশন করে লেখক উপন্যাসের শিল্পমূল্যকে বাড়িয়ে তুলেছেন।

বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে নাট্যগুণের অভাব নেই। রুক্মিণীর বিবাহসভা, সুশীলের গ্রেপ্তার ও মৃত্যু, যজ্ঞেশবাবুর জেল থেকে মুক্তি প্রভৃতি ঘটনা নাট্যগুণ সমৃদ্ধ।

ঔপন্যাসিক কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গতি সাধনে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধান ও অপ্রধান মিলিয়ে অসংখ্য চরিত্র বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। প্রধান পাত্র পাত্রী যজ্ঞেশ রায়, অবিনাশবাবু, সুশীল, অপ্রধান চরিত্র নবীন, বীরেন, গোপাল, সতীশ মুখুজ্জে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডোভার সাহেব, ক্লেজেট সাহেব, টহলরাম গঙ্গারাম, আশুতোষ মুখুজ্জে, সুরেন বাড়ুজ্জে, ধ্রুবেশ, অক্ষয় ফৌজদার, দুখু মৈত্র, ছাত্র ভূপতি, নৃপেন ও অতুল। প্রতিটি চরিত্রই কাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। পার্শ্ব চরিত্রগুলো মূল চরিত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছে। লেখকের কলমে প্রতিটি চরিত্রই সজীবতা দান করেছে।

উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে আর একটি আলোচ্য বিষয় হল ব্যঙ্গরস পরিবেশন। টহলরাম গঙ্গারামের বক্তৃতা, অক্ষয়, দুখু ও বীরেন এর পুলিশ কষ্টেবল হবার ঘটনা ব্যঙ্গরসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রমথনাথ উত্তমপুরুষে কাহিনী পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের জবানীতে। যেমন —

(ক) " আমি ভাবছি কি জানো ঐ সঙ্গে মলির বিয়েটাও হয়ে যাক।" (পৃঃ ১৮১)

(খ) " আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, রমণী আগে আসতো দেখা সাক্ষাৎ করতে, ঘনঘন দেখা সাক্ষাৎ চলে না।" (পৃঃ ১৮১)

সংলাপ অংশে চরিত্রের মুখে 'আমি' উত্তমপুরুষের ব্যবহার কথাসাহিত্যে জনপ্রিয় কৌশল। প্রমথনাথ উপস্থাপন রীতিতে এই কৌশল কাজে লাগিয়েছেন।

লেখকের বর্ণনাত্মক গদ্যরীতি প্রয়োগ কতটা সার্থক আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে তা আলোচনার দাবী রাখে। লেখক রবি ঠাকুরের বর্ণনা দিচ্ছেন —

"উপস্থিত সকলের কাছেই রবি ঠাকুর পরিচিত, শচীন কেবল ছবিতে মাত্র দেখেছে তাঁকে। তাঁকে দেখে প্রথম নজরেই তার মনে হল ছবিতে মানুষে কত প্রভেদ। এমন বলশালী দেহে এমন লাবণ্য। সোনার চশমার মুখের রঙে এমন মিল, আর শান্ত অচঞ্চল চোখ দুটিতে শরৎকালের স্বচ্ছ জ্যোৎস্না ওষ্ঠাধর প্রসন্ন অনেক হাসির স্মৃতিতে মন্ডিত। পরণে কুঞ্চিত ঢাকাই ধুতি গায়ে গরদের ঢিলেহাতা পাঞ্জাবি, তার উপরে গরদের চাদর, হাতে মোটা মাথা বাঁকানো মোটা মনক্কা বেতের লাঠি। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলো বসুন বসুন বলে তিনি একান্তে বসে পড়লেন।" [৯৬]

বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে লেখক স্থানে স্থানে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। যেমন -

"দূরে কোথায় শিয়াল ডাকছে, কাছেই উঠেছে ঝিঁঝির একটানা সুর, মাথার উপরে গাছের ডালে ভগ্ন নিদ্র পাখীর পাখা ঝটপটানি আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে জোনাকির অনিশ্চিত আলো।" (পৃঃ ১৫৯)

সুশীলের সিদ্ধেশ্বরী তলায় আগমন মুহূর্তে গা ছমছম করা এক প্রাকৃতিক পরিবেশকে অপূর্ব কাব্যধর্মী ভাষায় তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে লেখকের শিল্পকুশলতার পরিচয়।

প্রমথনাথ 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণে পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর তুলনায় অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'বঙ্গভঙ্গ' রোমান্টিকতাকে পরিহার করে হয়ে উঠেছেন একান্ত বাস্তবধর্মী। ভাষা বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বর্ণনামূলক ও সংলাপ দুটো অংশেই চলিত

রীতির ব্যবহার করেছেন। এখানে ভাষা হয়ে উঠেছে অনেকটা জীবনধর্মী তৎসম শব্দ বাহুল্যতা এখানে নেই। সহজ সরল সাবলীল কাব্যভাষা উপন্যাসটিকে রমণীয়তা দান করেছে।

লেখক সংলাপ অংশে চরিত্র উপযোগী ভাষা প্রয়োগে নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন। যেমন -

" গুড ইভনিং মিস রোজি, একটা আসামী কিছুতেই মুখ খুলছে না অথচ ওর পেটে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য আছে। "

রাইট এজ। রাইটো বাই বাই। আশাতীত ভাবে সাকসেসফুল।" (পৃঃ ২০৯) — এখানে ইংরেজীও বাংলা মিশ্রশব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক।

প্রমথনাথ ইংরেজী সংলাপকেও চরিত্রের মুখে দিয়েছেন যেমন, " পুলিস সাহেব একান্তে হরিপদর উদ্দেশ্যে বলল, What is all this? Is this decasting!

হরিপদ একান্তে বলল, Traitors! All Swadeshi walas !" [৯৭]

ইংরেজী সংলাপ অংশটি অসঙ্গতির সৃষ্টি করে নি।

লেখক স্থানে স্থানে হিন্দী বাক্যের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। চরিত্র উপযোগী ভাষা ব্যবহারে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন -

(ক) " আরে বুড়্ঢা চুপ রহো। " (পৃঃ ১০২)

পাড়ে ব্রাহ্মণের ভাষা -

(খ) " কি করবেন বাবুজি, এহি তো সংসারের নিয়ম। তুলসীদাসজী ভাখামে বোলা হ্যায় - সদ গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করো উপদেশ। " (পৃঃ ২১২)

(গ) হিন্দী বাংলা ও ইংরেজী মিশ্রিত ভাষা ঃ

" বয়কট করনে পড়ে গা, বয়কট। বিলায়েতি ধোতি শাড়ি কাপড়া মৎ পিনহো, বিলায়েতি নিমক শক্কর মাৎ খাও - ইসিকা নাম বয়কট। বানিয়া শালোকে বেসাতি সে মারো চোট - তব

শালালোগ Will beg for mercy । হাত জোড় করে বলবে বহুত হুয়া, খুব হুয়া। ও শালা দেশ ছোড়কে ভাগ যায়েগা - বিলায়েত কা মাল বিলায়েত মে চলা যায়েগা।" [৯৮]

ক্লোজেট সাহেবের মুখের ইংরাজী উচ্চারণযুক্ত বাংলা ভাষার প্রয়োগ ঃ

(ক) "শহরের লোক সবাই বদ্‌মাশ আছে, সবাই হারামজাড আছে - আর তলে তলে সবাই স্বডেশী।"

(খ) "মহাজন অর্থে গ্রেটম্যান, টুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি।"

"টাহা উট্টম রূপে শিক্‌ষা করিয়াছি।"

"টুমি টোমার সমষ্ট সম্পট্টি স্বডেশী কলেজকে ডান করিয়াছে ইহা কি সট্য ?"

"এটক্ষনে শুডভাষা বলিটেছে। তুমি কি স্বদেশী আছে।" (পৃঃ ১২২)

"আজ টোমাকে পরিট্যাগ করিল, ভবিষ্যটে ডান করিলে কয়েড ও বেট্রাঘাট লাভ করিব।

"আদালতের - হাতার মধ্যে বন্ড্‌মাটরম ডনি করা চলবে না।" (পৃঃ ১২৩)

লেখক সাহেবের মুখে যে ভাষা দিয়েছেন তা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। চরিত্র উপযোগী ভাষা ব্যবহারে লেখক সুন্দর পরিমন্ডল গড়ে তুলেছেন।

শব্দগঠনের ক্ষেত্রেও লেখক সচেতন। তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিছু কিছু বিকৃত শব্দ প্রয়োগ করেছেন - যেমন ছেরাদ্দ, লুটিশ, মেসের নক্ষ্মী, চ্যাংড়ামি, ফ্যাকড়া, ভুজুংভাজুং ইত্যাদি।

বাক্যগঠনে স্থানে স্থানে বাগ্‌ধারার ব্যবহার করেছেন, যেমন খয়ের খাঁ, মরার উপর খাড়ার ঘা, কিল খেয়ে কিল চুরি, মাছের কাটা, দুই নৌকায় যাত্রা প্রভৃতি।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে প্রবাদ বাক্যগুলি চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করেছে। যেমন -

১) " সাগরে শয়ন যার শিশিরে ভয় কি তার।"

২) " যত্র দেশে যদাচার।"

৩) " যত মত তত পথ।"

৪) " শতং বদ মা লিখ।"

৫) " ধরি মাছ না ছুই পানি।"

৬) " দায়ী মোৎ দায়ী রাজী কি, করবে পাজী।"

৭) " ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ।"

কিছু কিছু পান্ডিত্য পূর্ণ বাক্য বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। যেমন -

১)" হাসলে যাকে সুন্দর না দেখায় সে ব্যক্তি সন্দেহ ভাজন।"

২)" পছন্দ নতুন দৃষ্টির ফসল।"

৩) " ক্ষুধা শয়তানের সৃষ্টি।"

৪) " বাঙালির চিত্তে মাঝে মাঝে প্রবল বর্ষণ নামে কিন্তু ধরে রাখতে পারে না সে জল, দুদিনের জলোচ্ছ্বাসের পরে অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়।"

৫) " স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অখন্ড মন্ডলাকারং, যাকে খন্ড করা অসম্ভব।"

৬) " হাসিতে যাকে ভীতকর মনে হয় তার থেকে শত হস্ত দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।"

৭) " দুঃখ ও আনন্দ প্রকাশের ভাষা এক।"

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন - খুঁটে খুঁটে, খড়খড়, ঘড়ঘড়, ঢাকঢাক, গুড়গুড়, ঠকঠক, চকচক প্রভৃতি।

'না' বাচক অব্যয় পদের ব্যবহার -

" আজতো আর কিছু এলো না।"

" নিষেধ করে দিয়েছিলাম না।"

" তবে এর আগে কখনো মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসেও দাঁড়ায় নি।"

" না, না, না, ভুল করিনি।"

— এখানে 'না' অব্যয়ের সার্থক ব্যবহার ঘটেছে।

প্রমথনাথ 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে স্থানে স্থানে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করেছেন। ছত্রিশ অধ্যায়ে " তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম . . . . সুজলাং সুফলাং . . . . , ষষ্ঠ অধ্যায়ে " পরিত্রাণায় সাধুনাং . . . প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোক উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের বাক্যগুলি বিভিন্ন মাপের - বড়, মাঝারি ও ছোট ধরণের বাক্য।

বড় বাক্য ঃ

" সুশীল সংযম, উপবাস ও স্নান করে প্রস্তুত হয়ে রইলো, কিন্তু বাড়িতে থাকবে অথচ খাবে না এমন তো সম্ভব নয় - অনেক রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, কাজেই মাদা নামে গ্রামে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বলে ভোরবেলাতেই রওনা হয়ে গেল আর সারাটা দিন এক বন্ধুর বাড়িতে আত্মগোপন করে থেকে সন্ধ্যার আগে সিদ্ধেশ্বরীতলায় গিয়ে পৌঁছালো, দেখলো ক্যাপ্টেন উপস্থিত।" (পৃঃ ১৪০)

দীর্ঘ বাক্যটিতে তিনটি কমা, একটি ও, একটি ড্যাসের পর বিরাম চিহ্ন বসেছে। মোট এগারটি সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যটিতে।

মাঝারি বাক্য ঃ

" সে স্থির করে ফেলল - তিনটা গুলি মারবে দেহে, চতুর্থটা দিয়ে শেষ করে দেবে নিজের জীবন, বেঁচে থাকলেও একদিন না একদিন কোন অজ্ঞেয় কারণে ওদের হাতে মরতে হবে, তার চেয়ে এইবারে - পরপর চারটা গুলি মারল লোকটার তলপেটে, রক্ত ছিটিয়ে -

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা, নিঃসার নিস্পন্দ।" (পৃঃ ২০২)

মাঝারি বাক্যটিতে তিনটি কমা, তিনটি সংযোগ চিহ্নের পর বিরাম চিহ্ন বসেছে।

ছোট বাক্য ঃ নিম্নোক্ত সংলাপটিতে ছোটবাক্যের সংখ্যা প্রচুর।

" যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করবে?

করিব।

মাতা পিতা ত্যাগ করিবে?

করিব।

ভ্রাতা ভগিনী?

ত্যাগ করিব।

দারা সুত?

ত্যাগ করিব।

আত্মীয় স্বজন ? দাসদাসী ?

সকলই ত্যাগ করিলাম।" (পৃঃ ১৪১)

ছোট ছোট বাক্য কিন্তু ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নি।

বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে অলঙ্কার ব্যবহার অনেক কম হলেও তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

(ক) অনুপ্রাস অলঙ্কার -

" একেবারে তাজপুর থেকে তাজ হাতে করে।"

— তাজপুর ও তাজ অনুপ্রাস অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

(খ) " হাইকোর্টে নয়, হাইয়েষ্ট কোর্টে।" (অনুপ্রাস)

উপমা অলঙ্কার ঃ

চরিত্রের রূপচিত্রণে উপমার ব্যবহার ঃ

" তার মনে হচ্ছিল সুরেন বাঁড়ুজ্জে বিশাল শাল্মলী তরু, যেমন বলিষ্ঠ তেমনি উচ্চ দিগন্তপ্রসারী শাখা প্রশাখাবহুল, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ঝড় ঝঞ্ঝাকে যেন বাধা দিতে উদ্যত। মোতিলাল ঘোষ ক্ষুদ্র শীর্ণ খর্বাকার ব্যক্তি, দেহের অস্তিত্ব নামে মাত্র, কিন্তু কি চোখ, মুখমন্ডলে কি বুদ্ধির ছটা, প্রভাবশালী মানুষের মস্তিষ্ক যেন মনুষ্যরূপ ধারণ করে সম্মুখে উপস্থিত।" [৯৯]

বস্তুবাচক উপমা ঃ

" রায়বাহাদুরের স্ফীতকায় নথির উপরে নৈবেদ্যের চূড়ায় সন্দেশটির মতো ভারতসচিবের পত্রখানি।"

পরিশেষে বলা যায় কাহিনী, চরিত্র, উপস্থাপন কৌশল ও ভাষাবিন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণ শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন।

'পনেরোই আগষ্ট'
উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণ

সত্তরটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের সঙ্গে 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের ঐক্য এখানেই দুটিই স্বাধীনতা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস, দুটি উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি দিনাজপুর, রাজসাহী ও কলকাতা শহর, বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুটি উপন্যাসেই বর্তমান। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুটো উপন্যাসেই বর্তমান। পূববর্তী উপন্যাসগুলির পরিচ্ছেদের

নামকরণ করেছেন ব্যঞ্জনাধর্মী বক্তব্যে সেখানে বঙ্কিম প্রভাবিত গতানুগতিক পথকে পরিহার করে অধ্যায়গুলোকে সংখ্যানামে চিহ্নিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

ভারত স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাহিত্য সত্যের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে উপন্যাসের প্লট গঠিত হয়েছে। শচীন, সুশীল, ভূপতি, রাধা, অরবিন্দ, মলিনা, শুভ্রা, যজ্ঞেশরায়, অবিনাশ, রুক্মিনী, লব, কুশ এরা প্রত্যেকেই দিনাজশাহী শহরের কাল্পনিক চরিত্র। ঐতিহাসিক চরিত্র গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, সূর্যসেন প্রভৃতি। এছাড়া ইংরেজ সমর্থন পুষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, দারোগা, পুলিশ প্রভৃতি চরিত্র উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাস কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রগুলি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। উপন্যাসের গঠনরীতির দিক থেকে ত্রুটি না থাকায় আঙ্গিক শিথিলতা নেই। লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলো সজীব হয়ে উঠেছে।

লেখক উপন্যাসের শুরুতে দেখিয়েছেন যমজ ভাই লব ও কুশের উপভোগ্য লড়াই দিয়ে এই লড়াই থামিয়ে দিয়েছিলেন তাদের পিসিমা।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন ভারত স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশপ্রেমিক লব ও কুশের প্রেরিত দুখানা চিঠির বক্তব্যে। লব গান্ধীজীর দলের কর্মীরূপে নোয়াখালিতে ও কুশ কম্যুউনিষ্ট দলের কর্মীরূপে কয়লাখনির মজুরদের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে যোগদানের ঘটনা দিয়ে।

'পনোরোই আগষ্ট' উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অভিনবত্বের দাবী রাখে। লেখক উপন্যাসে একাধিক চিঠিপত্রের ব্যবহার করেছেন। প্রথম চিঠিটি লিখেছে স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধা বৌদিকে উদ্দেশ্য করে। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছেন যজ্ঞেশ রায় শচীনকে উদ্দেশ্য করে উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে এই চিঠিটি স্থান পেয়েছে। তৃতীয় চিঠিটি অবিনাশ বাবু রুক্মিণীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে। চতুর্থ চিঠির অবতারণা হয়েছে লব ও কুশের লেখা যজ্ঞেশ রায়কে

উদ্দেশ্য করে। পঞ্চম চিঠিটি গান্ধীজীর লেখা লব ও কুশেকে উদ্দেশ্য করে। ষষ্ঠ চিঠি অরবিন্দ লিখেছে শচীনকে। সপ্তম চিঠিটি লিখেছে লব তার দাদু যজ্ঞেশ রায়কে। অষ্টম পত্রটি শুভ্রা শচীনকে লিখেছে। দশম চিঠিটি ভূপতি শচীনকে লিখেছে। একাদশ ও দ্বাদশ চিঠিদুটি পিতা মাতাকে উদ্দেশ্য করে লব ও কুশের লেখা। 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসগঠনে চিঠিগুলোর উপযোগিতা অনেক বেশি। ঘটনাধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে চিঠির মাধ্যমে।

ঔপন্যাসিক উপন্যাস গঠনে সম্পাদকীয় মন্তব্য, ভাষণ প্রভৃতির সংযোজন করেছেন। উপন্যাসে স্থানগত ও কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে যা শিল্পগুণের পরিচায়ক।

'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে নাট্যগুণের অভাব নেই। ঘটনাধারায় নাট্যোৎকণ্ঠা, নাটকীয় আকস্মিকতা স্থান পেয়েছে। রাধার মৃত্যু ঘটনা, অরবিন্দের আর্তি, মলিনা ও শুভ্রার অশ্রুধারা নাট্যগুণ সম্পন্ন।

প্রমথনাথ উপন্যাসে দেশাত্মবোধক গান, ছড়া, গীতার শ্লোক, মিথ কাহিনী, পরিবেশন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। এগুলো উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য।

হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাকে সুষমভাবে প্রয়োগে করে ভাষার ব্যপ্তিকে বাড়িয়ে তুলেছেন।

উর্দু ভাষার দৃষ্টান্ত ঃ

" পাকিস্থানকে বাস্তে জান দেনা, ঔর জানভি লেনা, লোহু দেনা ঔর লোহুভি লেনা। কংগ্রেস মুরদাবাদ।" [১০০]

হিন্দী ভাষার উদাহরণ ঃ

" চিটাগাংকো ফেরারী আসামী কো চাই। আউর তুমকো ভি চাই।

ঘরমে ঢুকনে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?

টানা মে হোগা" [১০১]

" বাস্ বাস্ বহুৎ খেল হুয়া, আভি মেরি দিল মেরি কলিজা।" [১০২]

রাজসাহীর আঞ্চলিক ভাষা ঃ

কর্তা দুয়ে যে হাজাক মাইল ফারাক, যাইমু ক্যামনে ? [১০৩]

ইংরেজী বাংলা মিশ্রিত বাক্য ঃ

" দেখো, জোড়াতাড়া দিয়ে অহিংসা হয় না, তবে কংগ্রেসের মুখে Peaceful ও Legitimate শব্দ দুটোতেই খুশী। সম্ভব নিয়ে রাজনীতি। আরও দেখো, a general never blames his tools. " [১০৪]

কিছু কিছু এপিটোন বা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন লেখক। যেমন - মধ্যবিত্ত হাসি, চোরা গোফতা, হল্লাগুল্লা, কাফে কাবারে, কথার পুলি পোলাও, মারহাব্বা ইত্যাদি।

দেশী শব্দ - ধামা কুলো, ধুচুনি, সরাব, শাবল প্রভৃতি।

ইংরেজী শব্দ - ক্যাপিটালিষ্ট, কলোনিয়াল সোসাইটি, থিসিস, এন্টিথিসিস, সিন্থিসিস, ইনটেলেকচুয়াল, প্রিন্সিপ্যাল, টাইপিস্ট, স্ট্রেচার ইত্যাদি।

উর্দু ভাষা ঃ মুলুক ই মালিক, আম হুকুম, ছিনকে লেও, পূরব, পছিম প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ - ফ্যা ফ্যা, ছ্যা ছ্যা, ট্যাঁ ফোঁ প্রভৃতি।

'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে উপমার ব্যবহার খুবই কম। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক চিত্রণে উপমা -

" কেবল ঐ চিন্তার প্রবাহে একটিমাত্র ধ্রুববিন্দু স্রোতের উপরে চাঁদের প্রতিবিম্বের মতো - শুভ্রাকে ভালবাসে।" [১০৫]

"চোখে পড়েছে ওদিকের ফুটপাতে অদৃষ্টের প্রহরীর মতো বারীন দন্ডায়মান।" [১০৬]

বর্ণনামূলক গদ্যরীতির ও সংলাপরীতি দুটি অংশেই সাধুভাষার প্রয়োগ করেছেন। সংলাপ অংশে উত্তম পুরুষে গল্প পরিবেশিত হয়েছে। আবার ন-চ, খ-চ নামের আদ্যক্ষর বসিয়ে সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র, জীবনানন্দের উপন্যাসে দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে প্রমথনাথের 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের আঙ্গিক বৈচিত্র্য অভিনব। ঘটনা সন্নিবেশে চরিত্রচিত্রণে, ভাষাব্যবহার ও উপস্থাপন রীতিতে লেখক মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন ।

- ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ -

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' ভূমিকা - পৃঃ ১৩-১৪

২) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৮২

৩) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৮৩

৪) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ১০৯

৫) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ১১১

৬) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩১১

৭) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩১৭

৮২) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ২৪৪-২৪৫

৯) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩২৭

১০) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩১২

১১) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩১৩

১২) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩১৪

১৩) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩১৪

১৪) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ৩১৭

১৫) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ১৭০

১৬) প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' - পৃঃ ১৩৯

১৭) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ২৫৭

১৮) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ৩৪

১৯) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ৩০৯

২০) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ৯

২১) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ১১২

২২) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ১৯০

২৩) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ২০০

২৪) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ২৫৭

২৫) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ১৬৩

২৬) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ২২২

২৭) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ৮৩

২৮) প্রমথনাথ বিশী ' চলনবিল ' - পৃঃ ১৭৬

২৯) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৮০৭

৩০) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৯৩৯

৩১) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৭১৯

৩২) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৬২৩

৩৩) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৭৭৫

৩৪) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৯২৭

৩৫) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৯২৭

৩৬) প্রমথনাথ বিশী ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' - পৃঃ ৭৫৩

৫৭) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ১৯১

৫৮) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৪০২

৫৯) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৮৩

৬০) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৩২১

৬১) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৪২৯

৬২) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৩৮৩

৬৩) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ২৭২

৬৪) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৩৮৫

৬৫) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৫১৫

৬৬) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৪৮৭

৬৭) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ২৫

৬৮) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৪৭৯

৬৯) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৫০৫

৭০) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ২৫৬

৭১) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৪১৩

৭২) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৪৮৬

৭৩) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ১৪৭

৭৪) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৪৫৫

৭৫) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৩০৯

৭৬) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৩১৫

৭৭) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৩৯৫

৭৮) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৩৯৪

৭৯) প্রমথনাথ বিশী ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' - পৃঃ ৫১০

৮০) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ১৫১

৮১) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ১৮৬

৮২) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ৫৪

৮৩) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ৪২৯

৮৪) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ৪২৮

৮৫) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ৪১৪

৮৬) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ১৭

৮৭) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ৩২

৮৮) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ৪৬

৮৯) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ১৫৭

৯০) প্রমথনাথ বিশী ' লালকেল্লা ' - পৃঃ ২৬৮

৯১) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ১২৬

৯২) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ১১০

৯৩) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ১২৭

৯৪) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ১১০

৯৫) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ১৮২

৯৬) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ৩৬

৯৭) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ৯৫

৯৮) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ৬৬

৯৯) প্রমথনাথ বিশী ' বঙ্গভঙ্গ ' - পৃঃ ১১৩

১০০) প্রমথনাথ বিশী ' পনেরোই আগষ্ট ' - পৃঃ ৪১৯

১০১) প্রমথনাথ বিশী ' পনেরোই আগষ্ট ' - পৃঃ ৪৩৯

১০২) প্রমথনাথ বিশী ' পনেরোই আগষ্ট ' - পৃঃ ৪৮১

১০৩) প্রমথনাথ বিশী ' পনেরোই আগষ্ট ' - পৃঃ ৪১৯

১০৪) প্রমথনাথ বিশী ' পনেরোই আগষ্ট ' - পৃঃ ১৯৯

১০৫) প্রমথনাথ বিশী ' পনেরোই আগষ্ট ' - পৃঃ ৪১১

১০৬) প্রমথনাথ বিশী ' পনেরোই আগষ্ট ' - পৃঃ ৩৩৭